বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়

www.banglabooks.in
B.B.
www.banglabooks.in

হাসির গল্প

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get *More*
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.banglabooks.in

Click here

আমাদের আদরের মিতুনকে-
জন্মদিনে দিলাম—

আত্রি মামু ও জয়া মামী
২৭/৭/৬৮—

পড়তে পড়াতে যে বইগুলির তুলনা নেই

সব সরেস (শ্রেষ্ঠ লেখকদের গল্প সংকলন)	...	মূল্য ৩.০০
বত্রিশ পুতুলের উপাখ্যান—খগেন্দ্রনাথ মিত্র	...	মূল্য ৩.৫০
ছোটদের আরব্য উপন্যাস—পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী	...	মূল্য ২.৫০
ছোটদের বেতাল পঞ্চবিংশতি—তারাপদ রাহা	...	মূল্য ২.৫০
স্বপন বুড়োর সফর (ভ্রমণ-কাহিনী)	...	মূল্য ২.৫০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাসির গল্প	...	মূল্য ২.৫০
বুদ্ধদেব বসুর হাসির গল্প	...	মূল্য ২.০০
আশাপূর্ণা দেবীর হাসির গল্প	...	মূল্য ২.০০
শিবরাম চক্রবর্তীর হাসির গল্প	...	মূল্য ১.৫০
আশা দেবীর হাসির গল্প	...	মূল্য ১.৫০
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ—বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য	...	মূল্য ১.২৫

প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাসির গল্প

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
৬/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
অনিলকুমার সরকার
এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
৬/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দাম : দুই টাকা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা :
শৈল চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :
শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রীমতী লাবণ্যময়ী দেবী
[illegible]
[illegible]

সূচী

ভূপালের কপাল	...	...	১
পরোপকার	...	...	১১
নিরুদ্দেশ	...	...	২৪
সান্তু ও দুধরাজকুমার	...	...	৩৮
অপরূপ কথা	...	...	৪৯
বিশ্বম্ভরবাবুর বিবর্তনবাদ	...	...	৬৩

ভূপালের কপাল

ভূপালের সঙ্গে সেদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। জরুরী কাজে টালীগঞ্জ যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পেছন থেকে আমার নাম ধরে এক চীৎকার! চীৎকার না বলে আর্তনাদ বলাই উচিত। মানুষ মানুষকে শুধু ডাকবার জন্যে অমন ভয়ানক আওয়াজ করে না।

কি হ'ল বুঝতে না পেরে সভয়ে পেছন ফিরেই ব্যাপার বুঝতে পারলাম। পেছনে ট্রামের ভীড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে ভূপাল।

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে বলে ট্রামে বেশ ভীড়। ট্রামের সীটে না কুলোবার দরুন অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। ভূপাল তারই ভেতর দিয়ে গম্ভীরমুখে এগিয়ে এল। সে সাধারণ এগিয়ে আসা নয়, কারুর পা মাড়িয়ে, কারুর কাপড়ে জুতোর কাদা লাগিয়ে, কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে যে ভাবে সে ঝড়ের মত ছুটে এল তাতে মনে হ'ল যেন আমার কাছে আসার ওপর তার জীবন-মরণের সমস্যা নির্ভর করছে।

উৎসুক হয়ে তাই তার দিকে তাকালাম। কিন্তু কাছে এলে সে শুধু বললে—"তুই!" যেন এতক্ষণ সে আমার জায়গায় আর কাউকে বসে থাকতে দেখেছিল।

তার চীৎকারে ও এই সম্ভাষণে একটু অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না। ভূপাল নিজেই আবার বললে—"ঈস্, কতদিন বাদে দেখা!"

এবার একটু সামলে নিয়েছি, বললাম—"হ্যাঁ, অনেকদিন, এখন যাচ্ছিস্ কোথায়?"

"আমি! একটু বালীগঞ্জে যাব ভাই।"

"বালীগঞ্জ!" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"হ্যাঁ বালীগঞ্জ! কেন বালীগঞ্জে গেলে কি হয়?"

কোন রকমে হাসি চেপে আমি বললাম—"না, হয় না কিছু, কিন্তু এ ত' টালীগঞ্জের ট্রাম !"

ভূপাল এবার একটু অবজ্ঞার হাসি হাসলে। আমার মস্তিষ্কের সুস্থতায় যেন তার বিশ্বাস নেই। তার ভাব দেখে একটু বিরক্ত হয়ে বললাম—"এটা যে টালীগঞ্জের ট্রাম, দেখে উঠিস্‌নি ?"

ভূপাল তবু বিজ্ঞের মত গম্ভীর স্বরে বললে—"টালীগঞ্জ যেতে চাস্ ত' তাড়াতাড়ি নেমে যা।"

এরপর আর কি করে তাকে বোঝান যায় ! আমার একার দ্বারা সম্ভবও হ'ত না, যদি না সে সময়ে পাশের কয়েকজন ভদ্রলোক বলে উঠতেন—"আরে এটা যে সত্যি টালীগঞ্জের ট্রাম মশাই !"

এবার ভূপালের বুঝি টনক নড়ল। একটু সন্দিগ্ধভাবে সে বললে—"কিন্তু আমি যে দেখে উঠলাম।"

সবাই এবার বললাম—"কিন্তু আমরা এতগুলো লোক কি ভুল করেছি ?"

ভূপাল এবার মাথা চুলকে বললে—"তাই ত'। বড় মুশকিল হ'ল ত' দেখি ! এই বৃষ্টির ভেতর আবার নামতে হবে। কতক্ষণ আবার বালীগঞ্জের ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তাই বা কে জানে।"

তার অবস্থা দেখে এবার করুণা হচ্ছিল, বললাম—"তোর যেমন বুদ্ধি। একটু না দেখে ওঠার জন্য এই কর্মভোগ হ'ল ত' !" ভূপাল চুপ করে রইল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন ভোগ তাকে ভুগতে হ'ল না। রাসবিহারী এভিনিউর মোড়েই তার বৃষ্টির ভেতর নামবার কথা। হঠাৎ কেমন করে সেইখানেই ট্রামের কারেণ্ট গেল বন্ধ হয়ে। কারেণ্ট ফিরে আসার আগেই দেখা গেল সারের পর সার ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে। ভূপাল তার ভেতর না ভিজেই ট্রাম পেয়ে গেল।

ভূপালকে এর মধ্যেই বেশ ভালো করে বোধহয় চেনা গেছে। এমন আল্‌গা আগোছালো লোক দুনিয়ায় যদি আর দুটি থাকে। সব সময়েই সে অন্যমনস্ক, সব কাজেই তার গল্‌তি। কীর্তি তার অনেক, বলে শেষ করা যায় না।

* প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাসির গল্প *

ভূপালের সঙ্গে হয়ত অপরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে দেখা করতে গেছি, বৈঠকখানার চাবি খুলে দিয়ে চাকর হয়ত ভেতরে খবর দিতে গেছে। দেখি ভূপাল ঘরে ঢুকেই সটান একেবারে সুইচ্ বোর্ডের কাছে গিয়ে হাজির। সুইচ্ বোর্ডে অনেকগুলো সুইচ্, আলোর—পাখার প্রভৃতি।

জিজ্ঞাসা করলাম—"করছ কি ভূপাল ?"

"দাঁড়াও না, বড্ড গরম।" বলে ভূপাল একটা সুইচ্ টিপে দিয়ে চেয়ারে এসে আরাম করে বসে পড়ে চোখ বুজে বললে—"আঃ !"

চটে উঠে বললাম—"আঃ কি হে ?"

ভূপাল চোখ বুজেই বললে—"আঃ কি ঠাণ্ডা !"

"কোথায় ঠাণ্ডা, চেয়ে দেখ দেখি একবার !"

ভূপাল একবার চোখ খুলে চাইল, তারপর একটু বিরক্ত হয়ে বললে—"ওঃ আলোটা জ্বেলেছি বুঝি !"

"কিন্তু, আঃ করছিলে কেন ?"

এবার ভূপালের মুখে আর কথা নেই। কিন্তু তা বলে ভেবো না যে ভয়ানক লজ্জিত হ'ল।

ভূপাল সে সবের ধার ধারে না। ভুল করা না করায় তার কিছু আসে যায় না। সব সময়ে সে নির্বিকার নিশ্চিন্ত।

তার নির্বিকার নিশ্চিন্ত হবার অবশ্য কারণ আছে একটা। কারণটা হচ্ছে তার কপাল। এরকম পৃথিবীতে কারও হয় না। লটারীতে অনেকে লাখ লাখ টাকা পেতে পারে, খানায় পড়ে গিয়ে কারু কারু মাটিতে পোঁতা সোনার ঘড়ায় হাত কেটে যায়, কিন্তু ভূপালের তুলনায় তাদের ভাগ্য কিছুই নয়। ভাগ্য তাদের একবারই কৃপা করে, কিন্তু ভূপালের বেলা ভাগ্যের ক্লান্তি নেই, নেই বিরক্তি। বালীগঞ্জের বদলে টালীগঞ্জের ট্রামে চেপে তাকে ভুগতে হয় না কোন দিন। তার কপালে উপযুক্ত সময়ে ট্রামের ক্যারেন্ট যায় বন্ধ হয়ে। ভূপাল তাই বেপরোয়া ভাবে চলে। সে জানে ভাগ্য তার কাছে হার মেনেছে।

❋ প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাসির গল্প ❋

ভূপালের সঙ্গে তখন এক মেসে থাকি। রাত্তির বেলা খেয়ে দেয়ে আঁচাতে গেছি, হঠাৎ ভূপাল চেঁচিয়ে উঠল—"ওই যাঃ, সর্বনাশ হয়ে গেল।"

টুন্ করে আমরাও একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। ভূপালের ভাব দেখে মনে হ'ল অত্যন্ত মূল্যবান একটা কিছু সে হারিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম—"কি হ'ল হে? কি যেন পড়ে গেল!"

ভূপাল প্রায় কাঁদ-কাঁদ গলায় বললে—"পকেটে একটা আনি ছিল ভাই!"

এবার আমরা না হেসে পারলাম না—"একটা আনি হারাতেই সর্বনাশ!"

ভূপাল কিন্তু এ কথায় চটে উঠল—"একটা আনি কি সামান্য কথা! চার চারটে পয়সা। চারটে পয়সা চার হাত মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায় না—" ইত্যাদি বলে আলো আনিয়ে, চেঁচিয়ে সে এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুললে। কি করি, বাধ্য হয়ে সবাই মিলে ভূপালের আনি খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু দু'ঘণ্টা ধরে হয়রান হয়েও আনি পাওয়া গেল না। হয়রান হয়ে শেষে ভূপালও হতাশভাবে শুতে গেল।

পরের দিন সকালে কলতলায় স্নান করছি, এমন সময় চক্‌চকে কি একটা জিনিস চৌবাচ্চার এক কোণে যেন দেখতে পেলাম। তুলে দেখি—একটা চশমার কাঁচ। কলতলায় তখন অনেকে আছে, ভূপালও এসেছে সেজেগুজে বুঝি এক গ্লাস জল নিতে।

জিজ্ঞাসা করতে যাব, "এটা কার কাঁচ?" এমন সময় হাত থেকে ছোঁ মেরে ভূপাল সেটা নিয়ে বললে—"আরে, এই ত' আমার চশমার কাঁচ।"

আশ্চর্য হয়ে বললাম—"তোমার চশমার কাঁচ কি রকম?"

ভূপাল চোখ থেকে চশমা খুলে ফেললে। দেখলাম সত্যি তার একদিকের কাঁচ নেই। কাঁচটা স্বস্থানে লাগাবার চেষ্টা করতে করতে সে বললে—"দেখছ না আমার কাঁচ।"

"তা ত' এখন দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সকাল থেকে ওই খোলা চশমা চোখে দিয়ে থেকেও তুমি টের পাওনি?"

"বুঝতে পারিনি ভাই" বলে নির্বিকার ভাবে ভূপাল চলে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে বললাম—"তোমার না আনি হারিয়েছিল !"

"ওঃ আনি !" ভূপাল চমকে দাঁড়াল। তারপর এ পকেট ও পকেট হাতড়ে হঠাৎ সোৎসাহে বললে—"আরে আনিটা ত' পকেটেই আছে, কাল কাঁচটাই খুলে পড়েছিল।"

"আরে, এই ত' আমার চশমার কাঁচ"

আমাদের গত রাত্রের হয়রানির কথা স্মরণ করে তিক্তস্বরে বললাম—"পড়েই গেছল, গুঁড়ো হয়নি কেন তাই ভাবছি !"

কিন্তু কাকে বলা !

"গুঁড়ো হবে কেন ? বাঃ ?" বলে নির্বিকারভাবে ভূপাল বেরিয়ে গেল।

❋ প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাসির গল্প ❋

এই ভূপালের সঙ্গে এতদিন পরে দেখা। সেদিন ট্রামেই বুঝতে পেরেছিলাম ওই সামান্য আলাপে সে সন্তুষ্ট থাকবে না, আবার দেখা করতে আসবেই। ভূপালের বন্ধু-বৎসলতা বিখ্যাত।

কিন্তু ভূপাল যেদিন এল সেদিন আমি জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। বিশেষ কাজে আমার দিল্লী যেতে হচ্ছে।

ভূপাল শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললে—"চ, তোকে তা হলে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি, খানিকক্ষণ ত' কথা কওয়া যাবে।"

ভূপাল ট্রেনে তুলতে এসে সাহায্যের চেয়ে বিব্রতই বেশী করে তুলবে মনে করে তাকে বাধা দিতে পারলাম না। সত্যি অনেকদিন বাদে দুজনের দেখা হয়েছে।

সারাপথ বেশ ভালো ভাবেই এল। প্লাটফর্ম টিকিট কিনে আমায় ট্রেনের কামরা পর্যন্ত এগিয়ে দিলে, কোন রকম গোলমাল না করে। এর মধ্যে শুধু কোথায় হোঁচট খেয়ে তার জুতোর হিলের খানিকটা গেছল উঠে। তার জন্যে সে নিজে একটু খুঁড়িয়েছে আর তার পেরেক-ওঠা জুতোয় স্টেশনের মোলায়েম প্লাটফর্ম একটু ক্ষতবিক্ষত করেছে। যাই হোক সে আমার দায় নয়, আমার মনে হচ্ছিল ভূপাল সঙ্গে যাবার ফাঁড়াটা বুঝি নির্বিঘ্নেই কেটে গেছে।

কিন্তু হায়! হঠাৎ ভূপালের খেয়াল হ'ল সেও দিল্লী যাবে। ট্রেনের কামরায় আমার সঙ্গে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ সে বললে—"বেশ লাগছে ভাই। চ, তোর সঙ্গে দিল্লীই যাই।" শুনে আমি তো অবাক। দিল্লী যেন চুঁচুড়ো, শ্রীরামপুর!—গেলেই হ'ল। বললাম—"দিল্লী যাবি কি রে? কিচ্ছু ঠিক নেই।"

"তাতে কি! সেখানে বড় মামা রয়েছে। দিন কয়েক থেকেই আসি।" বলে ভূপাল উঠে পড়ল।

"উঠছিস্ কেন?" জিজ্ঞাসা করলাম হতভম্ব হয়ে।

"বাঃ টিকিট করতে হবে না, তোর কাছে টাকা আছে ত?"

টাকা আমার কাছে ছিল, তবু ভূপালের এই আজগুবি খেয়ালে বাধা দেবার খানিকটা চেষ্টা আমি করলাম। কিন্তু ফল হ'ল না কিচ্ছু, খানিক বাদে আমার

কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভূপাল ছেঁড়া জুতো নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দিল্লীর টিকিট কাটতে গেল।

কি ভাগ্য, গাড়ী ছাড়বার আগেই ভূপাল এল ফিরে। মনকে আমি ততক্ষণ একরকম প্রবোধ দিয়েছি। হাজার হোক সঙ্গী হিসাবে ভূপালের গুণ অনেক। দিল্লী পর্যন্ত একসঙ্গে ত' যাওয়া যাবে। ফাঁড়াটা অল্পের উপর দিয়েই কেটে গেছে।

কামরায় লোক আর বেশী কেউ নেই। দুজনে বেশ আরাম করে বসে গল্প করতে করতে চললাম। বর্ধমানে স্ফূর্তি করে দুজনে খাওয়া গেল, আসানসোল পর্যন্ত ভালোই কাটল।

তারপর সেখানে কামরায় উঠল টিকিট-চেকার। আমার টিকিট প্রথমে দেখে তাতে সই করে চেকার ভূপালের টিকিট চাইলে।

ভূপালের পকেট হাতড়াবার ঘটা দেখে প্রাণে একটু ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু খানিক বাদে সে টিকিট বার করে দিলে এক পকেট থেকে।

চেকার সে টিকিট হাতে নিয়ে এপিঠ ওপিঠ দেখে বললে—"এ কি মশাই ?"

ভূপাল গম্ভীর হয়ে বললে—"দেখতে পাচ্ছেন না টিকিট !"

"হ্যাঁ টিকিট তা জানি ; কিন্তু এ যে প্লাটফর্ম টিকিট !"

"প্লাটফর্ম টিকিট !" ভূপালের সঙ্গে আমিও একেবারে আকাশ থেকে পড়ে বলে উঠলাম।

"দেখুন না," বলে চেকার টিকিটটা এবার আমার হাতে দিলে। সেটা দেখে আমারও চক্ষুস্থির। সত্যিই সেটা হাওড়ার প্লাটফর্ম টিকিট।

এবার অত্যন্ত রেগে উঠে ভূপালকে বললাম—"দিল্লীর টিকিট কোথায় ? দেখ কোন্ পকেটে রেখেছ।"

"পকেটে ত' রাখিনি। সে ত' ফেলে দিয়েছি।"

"ফেলে দিয়েছি !" আমার গলা থেকে কথাটা অস্পষ্টভাবে বেরুল।

"হ্যাঁ প্লাটফর্ম টিকিট ভেবে আমি সেইটাই ফেলে দিলাম যে ! এই ট্রেনে ওঠবার আগেই ফেলে দিলাম।"

এরপর আর কি মুখ দিয়ে কথা বেরোয়! ভূপাল তখনও আমায় বোঝাবার চেষ্টা করছে—"দুটো টিকিটে গোলমাল হতে পারে বলেই ত' আমি আগে থাকতে প্লাটফর্ম টিকিটটা ফেলে দিলাম।"

"বেশ করলে!" বলে গুম্ হয়ে আমি তার দিকে পেছন ফিরে বসলাম। চেকার ত' আর ছাড়বে না। সে বললে—"টিকিট ত একটা করতে হবে!"

ভূপাল বললে—"তা হলে আর দিল্লী গিয়ে কাজ নেই ভাই! আমি ধানবাদেই নেমে যাচ্ছি ছোড়দার কাছে। তুই ধানবাদের একটা টিকিট কর।"

তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমি পকেট থেকে ব্যাগ বার করলাম। চেকারের হাতে একটা নোট দিলাম তা থেকে বের করে।

"হ্যাঁ টিকিট তা জানি ; কিন্তু এ যে প্ল্যাটফর্ম টিকিট!"

চেকার বললে—"চেঞ্জ ত নেই মশাই! আচ্ছা রাখুন নোটটা, আমি চেঞ্জ নিয়ে আসছি।"

চেকার চেঞ্জ আনবার জন্যে নেমে যেতেই আমি আবার পেছন ফিরে বসলাম। ভূপাল কাতরভাবে পেছন থেকে বললে—"দেখ আমার দোষ কি?"

"দোষ কি?" আমার চাপা রাগ এবার ভেঙ্গে পড়ল, তার অসাবধানতা, অন্যমনস্কতা, বোকামির জন্যে যা নয় তাই বলে খানিক ভর্ৎসনা করলাম, বললাম —মানুষ কি চিরকালই উজবুক থাকে। এত করেও শেখে না? কপালগুণে সে না হয় আগে বেঁচে গেছে। কিন্তু তাই বলে চিরদিন কি তাই হবে নাকি? এখন এ টিকিট কোথা থেকে আসবে?

ভূপাল শুনতে শুনতে বুঝি অনুশোচনার আবেগেই হঠাৎ উঠে পড়ল। তারপর দু'এক পা খুঁড়িয়ে হেঁটে তার যত রাগ গিয়ে পড়ল ছেঁড়া জুতোটার ওপর। পা থেকে জুতো দুটো খুলে নিয়ে একদিকে সবলে ছুঁড়ে দিয়ে সে নামবার উদ্যোগ করলে। জুতো দুটো তখন গাড়ীর একদিকে উবুড় হয়ে পড়েছে।

হঠাৎ আমি চমকে উঠে ডাকলাম—"শোন, ভূপাল, শোন।"

ভূপাল মুখ অন্ধকার করে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—"কি?"

"তোর জুতোর তলায় পেরেকে ওটা কি আটকে?"

ভূপাল কথাটা শেষ পর্যন্ত শুনলও না। "পেরেক!" বলেই একেবারে যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জুতো দুটোর ওপর। তারপর কিন্তু নিতান্ত স্বাভাবিক গলায় বললে—"এই ত দিল্লীর টিকিট!"

মনে হ'ল যেন সে এই কথাটা অনেকক্ষণ থেকেই বলে আসছে। হাতে নিয়ে সত্যিই এবার দেখলাম সেটা দিল্লীর টিকিট। ভূপালের ফেলে দেওয়া টিকিট কেমন করে তারই হিল-ওঠা জুতোর পেরেকে বিঁধে আটকে ছিল। এতক্ষণ তাই নিয়েই হাঁটা-চলার দরুণ টিকিটটা একটু ময়লা হলেও দেখলাম অচল হয়নি।

এমন কপালে বিশ্বাস করা যায়!

পরোপকার

ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি আমাদের বাড়ীর সবাইকার থেকে আমি আলাদা ধাতের।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, আমার ভায়েদের সঙ্গে আমার বিশেষ মিল নেই। আমার ভায়েরা সবাই ষণ্ডা, জোয়ান। শুধু তাই নয়, তারা সব কাজের লোক। পাড়ার যে কোন কাজেই লোকে সবার আগে ডাকতে আসে আমার ভায়েদের। প্রতিবেশীদের দায়ে অদায়ে আমার ভায়েরা যায় এগিয়ে, সবার আগে। দুপুর-রোদে পাঁচ ক্রোশ রাস্তা পরের মোট ঘাড়ে করে বয়ে দিয়ে আসা তাদের কাছে ছেলেখেলা। কন্‌কনে শীতের রাত্রে, লেপের ভেতর থেকে হাত বার করে বাতির সুইচ্‌টা টিপতেও যখন আলস্য হয়, তখনও তারা অম্লানবদনে গামছা কোমরে বেঁধে মড়া কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যাবার ডাকে বেরিয়ে পড়ে।

তাদের তুলনায় আমি বোধহয় একটু আয়েশী। গ্রীষ্মকালে গরমটা আমার বড় বেশী লাগে। রাতে ঘুমোবার চেষ্টা করে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ি যে দুপুরে একটু না ঘুমালে চলে না, আর শীতকালে ঠাণ্ডাটা আমায় এমন কাবু করে ফেলে যে নড়তে চড়তে বড় ভালো লাগে না। বর্ষাকালে শহরটা কি বিশ্রী হয়ে ওঠে সে ত' জানই। তাতে আর বেরুনই বা কেমন করে যায়! বৎসরের বাকী মাসগুলো আমার এসব ঋতুর ধাক্কা সামলাতেই যায়। সুতরাং আমাকে কাজের লোক ঠিক বলা চলে না।

বাইরের লোক ত' এই নিয়ে আমায় ঠাট্টা করেই, বাড়ীর লোকেও বাদ দেয় না।

মা হয়ত বলেন, "ওরা সব ঘোষালদের বিয়ে-বাড়ীতে খাটতে গেছে, বাজারটা তুই আজ করে নিয়ে আয় সুধীর!"

বাজারের নামেই আমার আতঙ্ক হয়। দোকানদারের সঙ্গে দরদস্তুর করবার কথা ভাবলে আমার গায়ে জ্বর আসে। দরদস্তুর না করে সোজাসুজি বাজার করে

আনলে বাড়ীতে গঞ্জনা সইতে হবে—"তুই কোন কর্মের নয়, একেবারে ডাহা ঠকে এলি।" আর দর করতে গিয়ে দোকানদারের দাম থেকে এক পয়সা কমাবার যো আছে! তার সে বিস্মিত বিদ্রূপের দৃষ্টিতে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয় আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জজ সাহেবকেই যেন একটা বেফাঁস গালাগাল দিয়ে ফেলেছি। না, বাজার করা বড় হ্যাঙ্গাম।

বলি, "বাজার! আজ আর বাজার করে কি হবে মা? বেশ বাদ্‌লা বাদ্‌লা আছে, খিচুড়ি কর না।"

মা রেগে চলে যেতে যেতে বলেন, "হ্যাঁ খিচুড়ি করবে! তোকে দিয়ে যদি একটা কাজ হয়!"

দাদা-বৌদিদের ঠাট্টা ত' আছেই।

খেতে বসে আবার বড় বৌদি বলেন, "তোমার মাংসটা শিলে একটু বেটে এনে দেব ঠাকুরপো, নইলে তোমার চিবোতে কষ্ট হবে!"

ডাক-পিয়ন হয়ত মেজদার চিঠি দিয়ে গেছে। তাঁকে সেটা এনে দিতেই তিনি তাড়াতাড়ি পাখাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, "হাওয়া খা, হাওয়া খা, একেবারে হাঁফিয়ে গেছিস্ যে!"

ঘরে বাইরে এত উপহাস আর কতদিন সওয়া যায়! মনে মনে একদিন আমি কঠোর সঙ্কল্প করে ফেললাম—এবার থেকে কাজের লোক হ'বই। পরের উপকার করতে গিয়ে প্রাণটাও যদি দিতে হয় তাও স্বীকার! সুযোগও জুটে গেল।

বাড়ীশুদ্ধ সবাই আমরা তখন দার্জিলিঙে। দার্জিলিঙে সেবার শীতটা একটু বেশী। তারি ভেতর শরীরটাকে একেবারে লোহার মত শক্ত করবার জন্যে পাহাড়ী ঘোড়ায় চড়ে সেদিন সকালে আমি মাইল দশেক জেদ করে ঘুরে এসেছি। সমস্ত শরীর এমন টাটিয়েছে যে মুখে ভাতের গ্রাস তুলতেও কষ্ট হয়। এমন সময় রবি মামার এক চিঠি এসে হাজির।

রবি মামা একটি পোস্ট কার্ডে অত্যন্ত কাতরভাবে লিখেছেন যে তাঁর অত্যন্ত অসুখ, এবার আর তিনি বাঁচবেন না। বাড়ীতে আরও নানা হ্যাঙ্গাম। কে কাকে

দেখে! লোকজনের অভাবে তাঁর শুশ্রূষাও হচ্ছে না। আমরা যদি তাঁকে শেষ দেখা দেখতে চাই তা হলে এই পোস্ট কার্ডটিকে টেলিগ্রাম মনে করে যেন অবিলম্বে চলে আসি ইত্যাদি।

রবি-মামা আমার মার আপনার ভাই নন—তিনি মার পিসতুতো ভাই। কলকাতায় তাঁদের প্রকাণ্ড পরিবার। লোকজন গিজ্‌গিজ করছে বললেই হয়। তা সত্ত্বেও তাঁর এই দুরবস্থার কথা শুনে আমার প্রাণটা একেবারে গলে গেল।

বড়দা যখন চিঠিটা পড়ে মার হাতে দিয়ে একটু হেসে বললেন, "রবি মামা ত আবার মর-মর। দেখবার কেউ নেই; আমাদের ত' যেতেই হয়," তখন বড়দার হাসিতে আমি রীতিমত চটেই গেলাম।

এটা কি হাসির ব্যাপার? চট্ করে বলে বসলাম—"তোমাদের কাউকে যেতে হবে না, আমিই যাব।"

দাদারা প্রথমতঃ সবাই অবাক। অনেকক্ষণ আমার দিকে বিস্মিতভাবে চেয়ে থেকে শেষে সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

মেজদা বললেন—"সেই ভালো! তুই-ই যা। রবি মামার যোগ্য লোক জুটেছে এবার!"

কিন্তু তখন কোন পরিহাসে আর আমায় দমাতে পারে না। আমি সঙ্কল্প একেবারে ঠিক করে ফেলেছি। বললাম—"যাই বল তোমরা, আমি যাচ্ছি।"

মা হেসে বললেন—"তুই যেমন পাগল! কোথায় যাবি?"

নিজের মূল্য প্রমাণ করবার এই সুযোগ কিন্তু অত সহজে ছেড়ে দিতে রাজী নই। পরোপকারের গভীর প্রেরণায়, দাদাদের ঠাট্টা, মার নিষেধ সব উপেক্ষা করে সত্যিই রাত্রে বেরিয়ে পড়লাম।

রওনা হবার সময় মা শুধু একটু হেসে বললেন—"একান্তই যখন যাবি বলে জেদ ধরেছিস্ তখন আর কি বলব! তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস্।"

মায়ের হাসির মানে যদি তখন বুঝতাম!

দার্জিলিঙের ঠাণ্ডা থেকে বাংলাদেশের গরমে নেমে আসবার সময় কি

আরাম যে হয় তা আগে ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। গরম বোধ হওয়া মাত্র জামা জোড়া খুলতে দাদারা বারণ করে দিয়েছিলেন, ঠাণ্ডা লাগার ভয়।

কিন্তু দাদাদের নিষেধ মানা শক্ত হয়ে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল গরম জামার কাপড়ের ভেতর সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। কলকাতায় পৌঁছতে পৌঁছতে হাড় মাংস আলাদা হয়ে যাবে।

দার্জিলিঙ মেল সেদিন একটু লেট ছিল। শিয়ালদায় পৌঁছলাম বেলা আটটায়। সেই সকালেই মনে হ'ল ঠিক সমস্ত কলকাতা শহরটা যেন একটা বড় যজ্ঞি-বাড়ীর রান্নাঘর! তাতে গা হাত পা ঝলসে যাচ্ছে।

কিন্তু আমি পরোপকারে চলেছি—কোন কষ্টই গ্রাহ্য করব না এই পণ, সোজা শিয়ালদা থেকে ট্যাক্সি নিয়ে মামার বাড়ী চললাম।

মামার বাড়ী শহরের একেবারে ওপ্রান্তে এমন একটি গলির ভেতর যেখানে গাড়ী ঢোকে না। সঙ্গে মোটঘাট একটু বেশীই ছিল, একলা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কাছে পিঠে মুটে মিলল না। ট্যাক্সিওয়ালাকে একটু দাঁড়াতে বলে মামার বাড়ী থেকেই চাকর এনে মোটঘাট নিয়ে যাব ভেবে এগিয়ে গেলাম।

গলির ভেতর হলেও মামাদের মস্ত সেকেলে বাড়ী। মামা যে রকম চিঠি লিখেছেন তাতে গিয়ে কি না জানি দেখব তাই অত্যন্ত বিষন্নমুখে যাচ্ছিলাম। বাড়ীর সামনের উঠোনে ছেলেপুলের দল পরমোৎসাহে ব্যাটবল খেলছে। যে বাড়ীতে এত বড় একটা অসুখ সে বাড়ীর ছেলেপুলের এতখানি খেলায় উল্লাস ঠিক শোভন ঠেকল না। কিন্তু ছেলেমানুষ! কি আর তারা বোঝে!

আর একটু এগোতেই মামার বড় ছেলের সঙ্গে দেখা। সেজে গুজে ফিট্‌ফাট হয়ে সাইকেল নিয়ে কোথায় বেরুচ্ছে। মামাত ভাইএর ওপর একটু রাগই হ'ল। বাপের সাঙ্ঘাতিক অসুখের সময় এত সাজগোজ কেমন করে সে করলে!

আমায় দেখেই আনন্দে হাত বাড়িয়ে সে বললে—"এই যে ছোড়দা! কোথা থেকে? তোমরা না দার্জিলিঙে ছিলে?"

"ছিলাম,ত।" বলে গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"ক'দিনেই এক পোঁচ রঙ যে উঠিয়ে ফেলেছ" বলে সোৎসাহে সে আমার পিঠ চাপড়ে দিলে। তার পিতৃভক্তি সম্বন্ধে সন্দেহটা আমার বেড়েই যাচ্ছিল। কিন্তু তার পরের কথায় একেবারে অবাক হয়ে গেলাম।

সাইকেলের পা-দানিতে একটা পা রেখে সে বললে—"একটু তাড়াতাড়ি আছে ভাই, ক্যারম কম্পিটিসনের সেমি-ফাইন্যাল, এসে তোমার সঙ্গে কথা কইব।"

সাইকেলে উঠে পড়ে চালিয়ে যেতে যেতে সে বলে গেল, "যাও না, বাবা বাইরের ঘরেই দাবা খেলছেন।"

দাবা খেলছেন! বাইরের ঘরে ঢুকে আমি তো অবাক। রবি মামা লম্বা তক্তপোশের ওপর বসে গড়গড়ার নলে টান দিতে দিতে পণ্ডিতগোছের চেহারার একটা লোকের সঙ্গে দাবা খেলছেন।

আমার প্রবেশ তিনি লক্ষ্যই করলেন না—বড়ের একটা কিস্তি তিনি সবেমাত্র দিয়েছেন। প্রতিপক্ষের দিকে চেয়ে বিজয়গর্বের হাসি হেসে তিনি বললেন—"কি ঠাকুর, বড় যে ঘর বেঁধেছিলে, সামলাও এবার।"

অপর পক্ষের শুকনো ছুচোলো মুখে কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। ধীরে ধীরে রবি মামার দাবাটি তিনি তুলে নিলেন।

রবি মামার হাসি মিলিয়ে গেল একপলকে। পণ্ডিত মশাইএর হাত থেকে দাবাটা একরকম থাবা মেরে ছিনিয়ে নিয়ে তিনি বললেন—"আরে মুখে দিয়ে দিলাম নাকি! দেখতে পাই নি ঠাকুর, দেখতে পাই নি। আরে ও কি আর একটা খেলা হ'ল!"

অপর পক্ষ তখনি নির্বিকার মুখে দাবাটি ফিরিয়ে দিলেন।

এর ভেতর একটু অবসর পেয়ে ডাকলাম—"মামাবাবু!"

মামাবাবু পলকের জন্য আমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন—"আরে সুধীর যে! কবে এলি?"

তারপর উত্তর শোনবার সময় আর তাঁর রইল না। আবার দাবার চালের ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বিস্মিত হয়ে অগত্যা তক্তপোশেরই একপাশে বসলাম। মামাদের খেলা চলতে লাগল। মাঝে আর একবার তিনি আমার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বললেন—"আরে সুধীর যে! কবে এলি?" পর মুহূর্তে আর তাঁর সাড়া রইল না।

রীতিমত চটে যাচ্ছিলাম। একবার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবার চেষ্টা করলাম—"মামাবাবু, আপনার না—"

কিন্তু আমার কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—"দাঁড়া দাঁড়া, সব শুনব, ঘোড়াটাকে বড় বেকায়দায় ফেলেছে!"

—বসে বসে মনে মনে গুমরাতে লাগলাম। ট্যাক্সিওয়ালা নেহাৎ যদি সরে না পড়ে থাকে, এতক্ষণে তার মিটার বহুদূর বেড়েছে।

ঘোড়া সামলে মামাবাবুর আর একবার ফুরসৎ হ'ল। বললেন—"কাল এসেছিস্ বললি না? বেশ বেশ, সব ভালো ত? কোথায় উঠেছিস্? এইখানেই থাকিস্ অথচ দেখা করিস্ না কেন?" বলতে বলতে মামাবাবুর পূর্বকথা বোধহয় একটু স্মরণ হ'ল।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "চিঠি পেয়েছিলি আমার? বাঁচবার আশা আর ছিল না রে! কোন মতে বেঁচে গেছি—ও কি! কিস্তি দিচ্ছ কি ঠাকুর? তোমার গজ নড়ে না যে!"

বললাম—"আজ তা হলে উঠি মামাবাবু!"

"উঠবি? তোর মামীমার সঙ্গে একটু দেখা করে যাবি না? আচ্ছা কাল আসিস্ কিন্তু, অনেক দরকারী কথা আছে।"

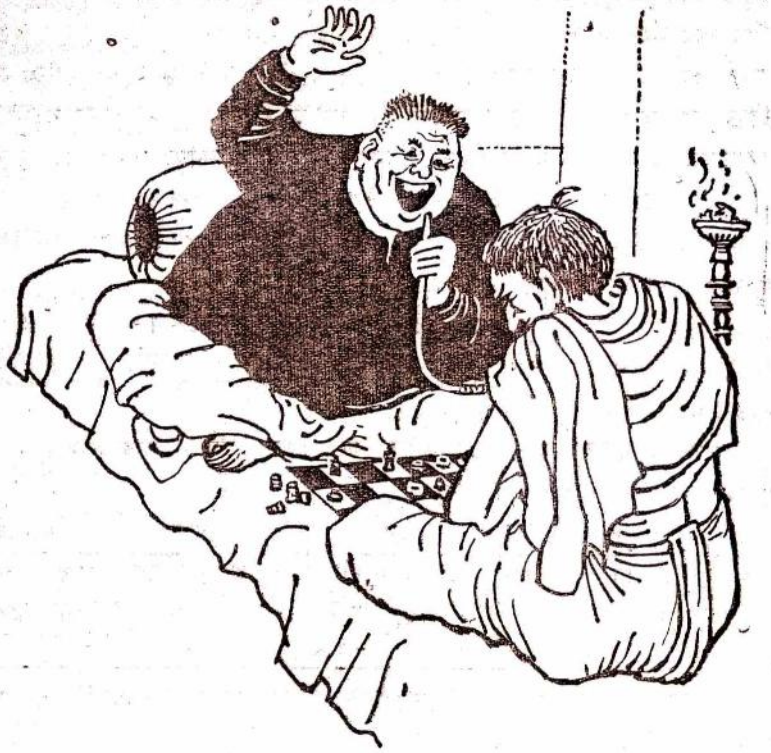

প্রতিপক্ষের দিকে চেয়ে বিজয়গর্বের হাসি হেসে বললেন—"কি ঠাকুর, বড় যে ঘর বেঁধেছিলে, সামলাও এবার!"

মনের কথা মনেই চেপে বেরিয়ে এলাম। বড় রাস্তায় এসে দেখলাম ট্যাক্সিওয়ালা চোর নয়, তার মিটার ঠিক আছে।

পরের দিন যাওয়া উচিত ছিল না, তবু গেলাম। মানুষের দোষ-ত্রুটি আমাদের অত গায়ে মাখলে চলে না। সৌভাগ্যের বিষয় মামাবাবু সেদিন দাবা খেলবার লোক পান নি। কাতরভাবে অনেক দুঃখের কথা জানালেন। একটা কাজ আমার তাঁর জন্যে করে দিতেই হবে। বড় ছেলে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ঢুকবে এবার। কলকাতার কোন বড় কলেজে সায়েন্স পড়বারই তার ইচ্ছে। কিন্তু অঙ্কে নম্বর কিছু কম আছে। এজন্য কলেজের কর্তারা হয়ত নেবে না। আমি যখন সেই কলেজেরই ছাত্র এবং এখানে আছি, তখন আমি যদি চেষ্টা-চরিত্র করে তাকে ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি। এটুকু উপকার আমার করতেই হবে। আমার ওপরই ছেলেটার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—আমি ছাড়া আর কেউ এ কাজ পারবে না ইত্যাদি নানা কথা বললেন।

পরোপকার করতে এসে একেবারে কিছু না করে ফেরা যায় না। সুতরাং রাজী হলাম। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রে দু'দিন নানা জায়গায় হাঁটাহাঁটি করে পায়ের জুতো ছিঁড়ে গেল বললেই হয়।

অনেক খোশামোদ, অনেকজনকে ধরে শেষ পর্যন্ত কলেজে আমার মামাত ভাইকে ঢোকাবার ব্যবস্থাও করলাম।

তার পরদিন মামাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেছি বিকেলবেলা। মামাবাবু বাড়ী ছিলেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর অবশ্য তাঁর দেখা পাওয়া গেল।

আমায় দেখেই মামাবাবু অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন—"এই যে এসেছ, তা হলে! আমি ভাবলাম বুঝি দার্জিলিঙ-ই চলে গেছ আবার।"

বললাম—"না, বেনুকে সেই আমাদের কলেজে ঢোকাবার ব্যবস্থাটা না করে কি যেতে পারি!"

মামাবাবু উদাসীনভাবে শুধু একটু 'ওঃ!' বলেই চুপ করলেন।

নিজেকেই আবার কথাটা তাই পাড়তে হ'ল। বললাম—"অনেক কষ্টে প্রিন্সিপালকে রাজী করিয়েছি।"

"তাই নাকি!" বলে মামাবাবু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

আবার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম—"ওকে একবার দেখা করতে হবে যে!"

মামাবাবু এবার হতাশভাবে বললেন—"তা করবে। তবে গোটাকতক টাকা লোকসান হবে এই যা!"

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"টাকা লোকসান?"

"হ্যাঁ, লোকসান বই কি! আজ আবার আর্ট স্কুলে ওকে ভর্তি করিয়ে এলাম কি না!"

মনে অত্যন্ত রাগ হলেও মুখে বললাম—"ভর্তি করিয়ে দিয়ে এসেছেন, তা হলে কি দরকার আবার সায়েন্স পড়তে যাবার?"

মামাবাবু খুশি হয়ে বললেন—"আমিও তাই বলি! কি জান? লেখাপড়া ত' ওর হবে না। কিন্তু আঁকার হাত ওর ভালো। ছেলেবেলা একটা গরু এঁকেছিল একেবারে গরুর মত শিঙ, চারটে পা, লেজ, সব ছিল তাতে।"

জীবনে আর মামার বাড়ীমুখো হ'ব না সঙ্কল্প করেই সেদিন সেখান থেকে বিদায় নিলাম। কিন্তু সঙ্কল্প ঠিক রাখতে পারলাম না—

আবার দার্জিলিঙ ফিরে যাবার সব ঠিক করে ফেলেছি এমন সময় পরের দিন বেলা এগারোটার সময় যে মেসে আমি উঠেছিলাম সেখানে মামাবাবু এসে হাজির।

আমায় দেখেই মামাবাবু একরকম কেঁদে ফেললেন। তাঁকে অনেক কষ্টে শান্ত করে যে কথা কয়টি আদায় করতে পারলাম তাতে বুঝলাম যে, এবার তাঁর বাড়ীতে সত্যি বিপদ হয়েছে। বেনু হঠাৎ কি রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বাড়ীর বয়স্করা সবাই ইতিমধ্যে অফিস গেছে। তাঁরও অফিস আছে। অফিস যাবার আগে যে একজন ডাক্তার ডাকবেন সে ক্ষমতাও তাঁর নেই। ভয়ে ভাবনায় তিনি এমন হতভম্ব হয়ে পড়েছেন যে কোন্ ডাক্তারকে যে ডাকবেন তা ঠিকই করতে পারছেন না। এদিকে আজকাল যা কড়াক্কড়ি, অফিস না গেলেও চাকরি নিয়ে টানাটানি হবার সম্ভাবনা।

তাঁকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—"আপনার কিছু ভাবনা নেই। আপনি অফিসে যান। আমি এখুনি ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছি।"

আমার দুটি হাত ধরে মামাবাবু আর একবার কেঁদে ফেলে বললেন—"তোমার ওপর ভরসা করে আমি যাচ্ছি। দেখো, যাবে তো বাবা?"

"সে কি কথা! আমি এখুনি যাচ্ছি।" বলে তাঁকে বিদায় করে পাঞ্জাবীটা মাথায় গলাতে গলাতে আমি ডাক্তার খুঁজতে বেরুলাম। অধিকাংশ ডাক্তার তখন 'কলে' বেরিয়েছেন, তাঁদের সদ্য সদ্য পাওয়া শক্ত। অনেক কষ্টে ভালো একজন বিশেষজ্ঞকে পেলাম। ডাক্তারবাবু তাঁর নিজের গাড়ী আনতে পাঠাচ্ছিলেন, কিন্তু সময় সংক্ষেপের জন্য তাও তাঁকে করতে দিলাম না।

একটা ট্যাক্সি ডেকেই তাতে তাঁকে চাপিয়ে সোফারকে জোরে হাঁকাতে বললাম। নিজের কর্মতৎপরতায় নিজেরই বিস্ময় লাগছিল। ভাবছিলাম—বড় ঠাট্টা করে দাদারা। একবার যদি এখন দেখতে পেত!

আগেই বলেছি মামাদের গলিতে গাড়ী ঢোকে না। বড় রাস্তা থেকে ট্যাক্সি বিদায় করে ডাক্তারবাবুকে হাঁটিয়েই নিয়ে গেলাম। ডাক্তারবাবু বোধ হয় একটু অপ্রসন্ন হলেন। কিন্তু সে তখন আমার দেখবার সময় নেই।

বাড়ীতে এবার সত্যই যে বিপদ হয়েছে কাছাকাছি যেতেই তা বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। বাইরে কোন লোকজন নেই। সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ।

কিন্তু বাড়ীর দরজাটাও যে বন্ধ! সজোরে গিয়ে ধাক্কা দিলাম। কোন সাড়া-শব্দ নেই। হ'ল কি তা হলে? ভয়ে আমার বুকটা কাঁপছিল। মামাবাবুর নাম ধরে ডেকে আবার কড়া নাড়া দিলাম। এবারেও কোন সাড়া নেই।

ডাক্তারবাবু খানিকটা দূরে দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁকে এভাবে দাঁড় করিয়ে রাখবার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে আরো জোরে দরজায় ধাক্কা দিলাম। এবার ভেতর থেকে সাড়া পেয়ে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

কিন্তু খানিক বাদে নিদ্রাজড়িত চোখ রগড়াতে রগড়াতে মামাদের পুরানো চাকর মধু যখন দরজা খুলে দাঁড়াল তখন অবাক হয়ে গেলাম।

মধু বিরক্ত হয়েই উঠে এসেছিল, আমায় দেখে একটু প্রসন্ন হাসি হাসবার চেষ্টা করে বললে, "কেউ ত বাড়ী নেই বাবু!"

"বাড়ী নেই কি রে ?"

"না বাবু, সব দক্ষিণেশ্বর গেছে যে, আমি শুধু আছি পাহারা দিতে।"

অবাক হয়ে বললাম—"বেনু বাবুর অসুখ করেছে না ?"

অসুখ ? মধু অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে বললে যে অসুখ ত বাবুর করেনি। তবে বেনু বাবু ভাতের সঙ্গে চুল না কি খেয়ে একবার বমি করেছিলেন বটে, কিন্তু সে ত' কিছু নয়। দিদিমণির বাড়ী থেকে মোটর আসতে তাঁরা সবাই বেশ সুস্থ শরীরে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গেছেন।

দূর থেকে ডাক্তরবাবুর মৃদু কাশির শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হ'ল ধরণী দ্বিধা হও। কিন্তু ডাক্তারবাবুকে এভাবেই বা কি করে ফেরান যায়! একটা কিছু উপায় ত' ঠাওরান দরকার—

মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম—"ডাক্তারবাবু, একটু ভেতরে আসবেন ?"

ডাক্তারবাবু বেশ গম্ভীরমুখে ঘরে এসে ঢুকে একবার গলা খাঁকরি দিলেন।

প্রত্যুত্তরে আমি একবার গলাটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করলাম।

ডাক্তারবাবু বললেন—"রোগী কোথায় মশাই ?"

অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে বললাম—"আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না, আমার নিজের জন্যেই আপনাকে ডাকা।"

পলকের জন্য ডাক্তারবাবুর ভুরু দুটো বোধ হয় একটু উঠল, তারপর নিতান্ত নির্বিকারভাবে তিনি আমার হাতটা টেনে ধরে বললেন—"কি অসুখ ? জ্বর ?"

"আজ্ঞে না, এই পেটের এইখানটায় একটা ব্যথা!"

"হুঁ, শুয়ে পড়ুন।"

তাই পড়লাম। পেটের ব্যথার কথাটা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সত্য হয়ে উঠল। ডাক্তারবাবু সজোরে এক জায়গায় টিপে বললেন—"এইখানটায়, কেমন ?"

কোন রকমে গোঁয়াতে গোঁয়াতে বললাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বেশ, উঠে পড়ুন, কাল একটা জোলাপ নেবেন। আর এক হপ্তা খালি জল-বার্লি পথ্য।"

"আজ্ঞে যা বলেন!"

ডাক্তারবাবু হাত বাড়ালেন, কর্‌করে আটটা টাকা নিজের পকেট থেকে বার

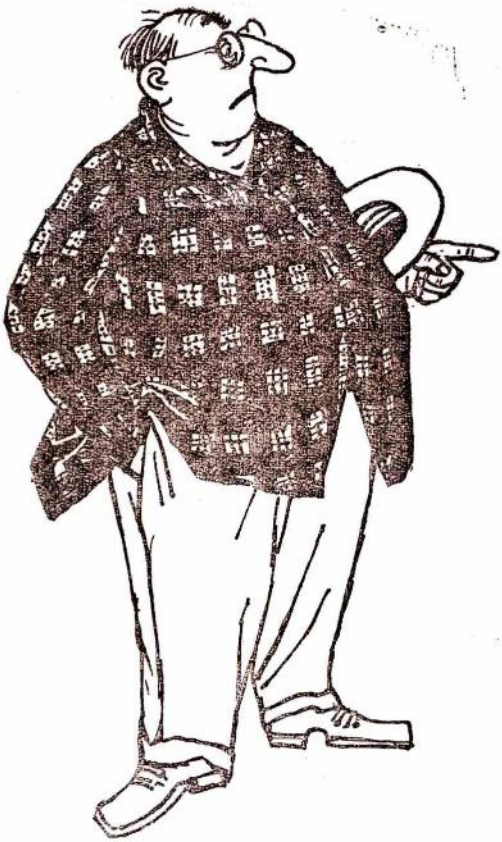

করে সে হাতে দিলাম। ডাক্তারবাবু টাকাগুলো পকেটে ফেলে টুপিটা বগলে চেপে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন—"দেখুন!"

"আজ্ঞে!"

"রোগটা আপনার পেটের নয়, মাথার! বুঝেছেন?"

"বেশ, উঠে পড়ুন, কাল একটা জোলাপ নেবেন। আর এক হপ্তা খালি জল-বার্লি পথ্য।"

এই বলেই ডাক্তারবাবু বেরিয়ে গেলেন। নিঃশব্দে তাও হজম করলাম।

* * * *

দার্জিলিঙ ফিরে আসার পর দাদা-বৌদিরা কি বলেছেন সে কথা কারুর শোনবার কোন প্রয়োজন নেই।

নিরুদ্দেশ

পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার! পাঁচশো-সাতশো নয়, একেবারে পাঁচ হাজার! ব্রজবিনোদবাবুর চোখে আর ঘুম নেই। ঘুম যদি আসে, তা হলে পাঁচ হাজার কর্‌করে ঝক্‌ঝকে টাকা ছাড়া আর কিছুরই স্বপ্ন নেই। কখন সে পাঁচ হাজার টাকা ঝন্‌ঝন করে তাঁর সিন্দুকে পড়ে রূপোর ঝরণার মত, কখনো বা খস্‌খসে খাস্তা নোট হয়ে রাশি রাশি তাঁর বিছানাময় ছড়িয়ে পড়ে চৈতী হাওয়ায় বনের ঝরা পাতার মত।

তা স্বপ্নে দেখা আর আশ্চর্য কি? পাঁচ হাজার টাকা তো বলতে গেলে ব্রজবাবুর হাতের মুঠোয়! হাতের মুঠোয় মানে এই পাশের ঘরের আরাম-কেদারায়—যে কেদারায় কারুর এ পর্যন্ত বসা দূরের কথা, যা ছোঁয়ারও পর্যন্ত হুকুম ছিল না। সেই আরাম-কেদারায় পাঁচ হাজার টাকা জলজ্যান্ত হয়ে বসে আছে, মনে করতেও ব্রজবাবুর সারা গায়ে কেমন একটা কাঁটা দিয়ে ওঠে আনন্দে। ব্রজবাবু পাঁচ হাজার টাকা যেন অনুভব করতে পারেন এ-ঘর থেকেই, চোখে না দেখেই, শুধু নাকে গন্ধ শুঁকেই। গন্ধ অবশ্য ঠিক পাঁচ হাজার টাকার বোধ হয় না—তাঁর আর একটি বড় শখ—তাঁর দেরাজে রাখা দামী হ্যাভানা চুরুটের গন্ধের সঙ্গেই তার যেন কেমন একটা সাদৃশ্য আছে বলে সন্দেহ হয়। মূর্তিমান পাঁচ হাজার কি তাঁর দেরাজ খুলে তাঁরই দামী চুরুটের শ্রাদ্ধ করছে নাকি!

ব্রজবাবুর বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। অন্য সময় হলে বুঝি রক্তটাও মাথায় চড়ে যেত। কিন্তু এখন অমন ধৈর্য হারাবার সময় নয়। একটা বেফাঁস কিছু হয়ে গেলেই পাঁচ হাজার ফস্কে যেতে কতক্ষণ! তবুও চুরুটের ব্যাপারটার একটু তদন্ত না করলে যে মন মানে না।

ব্রজবাবু ধীরে সুস্থে, কিছুই যেন হয়নি এমনি ভাবে পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকেন—মুখে একটি সাদর আপ্যায়নের হাসি টানতেও ভোলেন না।

আরাম-কেদারার মূর্তিমান পাঁচ হাজার তাঁর দিকে কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করে না। নিজের মনেই চুরুট টেনে যায়—তাঁর সেই দামী হাভানা চুরুট!

ব্রজবাবু আরও একটু এগিয়ে যান এবং ওই অবস্থায় কণ্ঠে যতখানি মধু রাখা সম্ভব, ততখানিই ঢেলে বলেন—"এই যে শিশির—তোমার কি বলে, চুরুট খাওয়াও অভ্যেস আছে নাকি?"

শিশির, ওরফে ব্রজবাবুর মূর্তিমান পাঁচ হাজার তাঁর দিকে এতক্ষণে একবার কৃপাকটাক্ষ করে সংক্ষেপে জানায়—"না।"

চুরুটে টান কিন্তু তার সমানে চলতে থাকে।

"না!" ব্রজবাবুকে একসঙ্গে মুখের ও হৃদয়ের মাসল্ কন্‌ট্রোল করতে হয়! হেসে বলেন—"ও! অভ্যেস নেই! শখ করে একটু চেখে দেখছো বুঝি?"

আবার সংক্ষিপ্ত জবাব—"হ্যাঁ।"

"কি জান শিশির,"—ব্রজবাবু স্নেহের উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করেন—"অভ্যেস না থাকলে চুরুট খাওয়াটা আবার ভালো নয়। কি বলে—মাথা ঘুরতে পারে। তাছাড়া তোমাদের এই বয়েসে...."

কথাটা আর শেষ করা হয় না, শিশির হাতের চুরুটটা—সবেমাত্র ধরানো আস্ত চুরুটটা—নেহাৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বাইরে জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়ে বলে—"নাঃ, এ চুরুটটা ভারী কড়া!"

চুরুটটার সঙ্গে ব্রজবাবুর হৃৎপিণ্ডটাও যেন জানালার বাইরে ছিট্‌কে পড়ে। এই নিদারুণ যুদ্ধের বাজারে একটা দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য চুরুট মাত্র ক'টা টান দিয়ে যে বাইরে ফেলে দেয়, কান ধরে তাকেও তৎক্ষণাৎ চুরুটের পেছনে পাঠাবার প্রবল অভিলাষ হয়, কিন্তু সে অভিলাষ কোন রকমে দমন করে তিনি বলেন—হেসেই বলেন—"কেমন বলেছিলাম কিনা!"

"কি বলেছিলেন?"—শিশিরের গলায় বেশ ঝাঁঝ।

"ওই যে!" ব্রজবাবু অত্যন্ত অপরাধীর মত বলেন—"অভ্যেস না থাকলে চুরুট খাওয়া ভালো নয়।"

"বেশ, কাল থেকে সিগারেট আনিয়ে দেবেন। একটু একটু করে অভ্যেস করতে হবে।" শিশির আদেশ জারী করে।

"সিগারেট আনিয়ে দেব!"—ব্রজবাবু খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থাকেন।

একেবারে বিস্ময়ে নির্বাক!

"না আনিয়ে দেন, দেবেন না। দরকার নেই আমার"—শিশির আরাম-কেদারা থেকে উঠে পড়ে বেশ রাগের সঙ্গেই।

ব্রজবাবুর তৎক্ষণাৎ হৃৎকম্প হয়! পাঁচ হাজার টাকা বুঝি হাত-ছাড়া হয় এক্ষুণি! শশব্যস্ত হয়ে তিনি বলেন—"আহা, রাগ করছ কেন? আমি কি আনিয়ে দেব না বলেছি? তুমি যাচ্ছ কোথায়?"

"একটু বায়োস্কোপে যাব ভাবছি। কাজ নেই, কর্ম নেই, চুপচাপ রাতদিন ঘরে বসে থাকতে তো পারি না।"

"তা তো নিশ্চয়!"—একদিকে আশ্বস্ত হলেও আবার একটা বাড়তি খরচের সম্ভাবনায় মনে মনে বিচলিত হয়ে ব্রজবাবু বোঝাবার চেষ্টা করেন—"কিন্তু বায়োস্কোপের বদলে ঘরে বসে বই পড়লেই তো পার, ভালো ভালো বই, আমি না হয় লাইব্রেরী থেকে আনিয়ে দিচ্ছি।"

"বই পড়লে আমার মাথা ধরে।" সোজা জবাব দেয় শিশির আলনা থেকে শালটা—ব্রজবাবুর দামী শালটা গলায় জড়িয়ে, তারপর হাত বাড়িয়ে বলে—"দিন পাঁচটা টাকা।"

"ও! অভ্যেস নেই! শখ করে একটু চেখে দেখছো বুঝি?"

"পাঁচ টাকা! বায়োস্কোপে যেতে পাঁচ টাকা কেন? পাঁচ আনার টিকিটে গেলেই ত' হয়।" ব্রজবাবু কাতরভাবে নিবেদন করেন।

"না, হয় না। টিকিটের দাম দেড় টাকা ছাড়া চা খাওয়া আছে, আরো খুচরো খরচ আছে। পাঁচ টাকায় হবে কিনা, তাই ভাবছি।"

শিশিরকে আর ভাববার অবসর দিতে ব্রজবাবুর সাহস হয় না। চট্‌পট্‌ তিনি পাঁচটা টাকা বের করে দেন। শিশির অম্লানবদনে টাকা ক'টা পকেটস্থ করে বলে— "আমার চাকরির ব্যবস্থা আপনি কিন্তু এখনও করলেন না। এ রকম রোজ রোজ হাত পেতে আপনার কাছে টাকা নিতে কিন্তু আমি পারব না বলে দিচ্ছি।"

গোদের উপর বিষফোঁড়াটুকুই ব্রজবাবুর পক্ষে অসহ্য। পাছে নিজেকে সামলাতে না পারেন, এই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি যাহোক একটা আশ্বাস দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে হিসেব করতে বসেন। পাঁচ হাজার টাকার এই দাঁওটা গেঁথে ডাঙ্গায় তুলতে এ পর্যন্ত চারে, সুতোয়, ছিপে, বঁড়শিতে তাঁর কি পর্যন্ত গেছে, তারই হিসেব।

ব্রজবাবু যতক্ষণ হিসেব করছেন, ততক্ষণে এ গল্পের গোড়াকার কথাটা বোধ হয় সেরে নেওয়া যেতে পারে।

ব্রজবাবুর পরিচয় নিশ্চয়ই দিতে হবে না। তাঁর নাম এ পাড়ার কে না জানে এবং কে-ই বা মুখে আনে!—অন্ততঃ এক বেলার খাওয়া-দাওয়া না সেরে নয়। মাত্র তিন বছর হ'ল, তিনি মোটা পেন্‌সন নিয়ে এ-পাড়ায় এসে ডেরা বেঁধেছেন, কিন্তু এই তিন বছরেই পাড়ার ছেলে-বুড়ো সবাই তাঁকে হাড়ে হাড়ে চিনেছে! তিনকুলে কেউ নেই, অবস্থাও বেশ ভালো, কিন্তু এমন হাড়-কঞ্জুস দুনিয়ায় আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ। এই সেদিন পাড়ার ছেলেরা সাতদিন তাঁর দোরে হাঁটাহাঁটি করে সরস্বতীপূজোর জন্যে নগদ একটা সিকি চাঁদা-হিসেবে আদায় করেছিল—পরে অবশ্য দেখা গেছিল—সিকিটা অচল।

তা বলে ব্রজবাবু খরচ করেন না, এমন নয়, কিন্তু সে শুধু দুটি ব্যাপারে; এক তাঁর নিজের সুখ আর শখের জন্যে, আর ফাঁকিতে যদি কোথায়ও মোটা কিছু দাঁও মারা যায়, তারই ফিকিরে। দাঁও মারবার ফিকিরে হেন ক্রসওয়ার্ড

পাজ্‌ল্‌ নেই, যাতে তিনি একটা দুটো জবাব না পাঠান ; এমন 'ঘরে বসিয়া এক হইতে পাঁচশ' টাকা উপার্জ্জন'এর বিজ্ঞাপন নেই, যা নিয়ে দু'একবার চিঠি চালাচালি না করেন ; এমন কি আর্থিক উন্নতির ভরসা দেয় এমন কবচের খবরাখবরও তিনি রাখতে ছাড়েন না।

কিন্তু এই দুটি ব্যাপার ছাড়া পরস্মৈপদী হওয়ার সুযোগ পেলে বাজে খরচের ধার দিয়ে তিনি যান না। পাড়ায় ভুবনবাবুর বাড়ীতে সকালে চা-টা ভালোই হয়, টোস্টও বুঝি থাকে সঙ্গে। ব্রজবাবুর তাই সকালে একবার ভুবনবাবুর সঙ্গে দেখা না করলে দিনটাই খারাপ যায়। বিকেলে ভবতোষবাবুর বাড়ীর তিনি নিত্য অতিথি। সেখানে একটু রাজনীতি আলোচনা না করলে তাঁর নাকি ঘুমই হয় না। বলা বাহুল্য, জলখাবারটা সেইখানেই সারেন। সূর্যবাবুর বাড়ীর পেছনে ছোট্ট একটা বাগান আছে। প্রায়ই সেখানে ব্রজবাবু পায়ের ধুলো দেন কচি ঢেঁড়স বা পাকা পেঁপেটা, কলাটা, মূলোটা, বেগুনটা, শশাটার তারিফ করতে। ঠিকমত তারিফ করলে কিছু তাঁকে নিয়েও আসতে হয় সঙ্গে—নিদেন পক্ষে দুটো কাঁচালঙ্কা না নিয়ে তিনি ফেরেন না।

কিন্তু ব্রজবাবুর এমনই দুর্ভাগ্য যে, পাড়ার লোকের পাল্টা খাতির করবার সুযোগ তাঁর এ পর্যন্ত হ'ল না। বাড়ীতে কেউ কদাচিৎ যদি আসে, তা হলে ঠিক সেইদিনই তাঁর চাকরটা কোথায় যে পালিয়ে থাকে, তার আর ঠিকানা মেলে না ; চাকরটা থাকলেও উনুন আর ধরতে চায় না ; আর যদিও বা উনুন ধরে, হঠাৎ সেইদিনই চায়ের টিন, চিনির বোয়েম এমন খালি থাকে যে, চাকরকে [illegible]মক দিয়ে বাজারে পাঠাতে হয় তৎক্ষণাৎ। ব্রজবাবুর চাকর সে বেলা যে আর [illegible]র থেকে ফেরে না, তা বোধ হয় বলাই বাহুল্য।

এহেন আমাদের ব্রজবাবুর জীবনে হঠাৎ পাঁচ হাজার টাকার দাঁও কেমন করে দেখা দিল, এবার সে-কথা বলি। সকালে ভুবনবাবুর বাড়ীতে চায়ের পাট সেরে ব্রজবাবু সেদিন পাড়ার লাইব্রেরীর 'ফ্রী রীডিং-রুমে' বসে খবরের কাগজগুলোর সার সংগ্রহ করছেন। এটিও ব্রজবাবুর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। রীডিং-রুমে ঢুকে

সকালবেলা সর্বপ্রথম তিনি খবরের কাগজগুলো হাত করেন। সেই খবরের কাগজ একটির পর একটি একেবারে নিংড়ে নিঃশেষ না করে তিনি কাউকেই ছাড়েন না। খবরের ওপর তাঁর অবশ্য কোন টান নেই। তিনি পড়েন শুধু বিজ্ঞাপন।

সেদিন বিজ্ঞাপনের পাতাগুলো প'ড়ে ব্রজবাবু একরকম হতাশই হয়েছেন। একটি ছাড়া আর কোনও বিজ্ঞাপন তাঁর মনে দাগ দেয়নি। বিজ্ঞাপনটি টাকে চুল ওঠাবার কোন এক অত্যাশ্চর্য তেলের। ব্রজবাবুর মাথায় টাক আছে সত্যি, কিন্তু সে টাক সারাবার ব্যাকুলতায় ও বিজ্ঞাপনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হননি! তাঁর আকর্ষণের কারণ আলাদা। টাকের তেলের আবিষ্কারক সগর্বে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর এই তেলের দাবি মিথ্যে বলে কেউ প্রমাণ করতে পারলে তিনি এক হাজার টাকা পুরস্কার দিতে প্রস্তুত। নিজের মাথার টাকে ওই তেলকে বিফল প্রমাণ করে আইনের ফেরে হাজার টাকা হাত করা যায় কিনা, প্যাঁচ কষতে কষতে পাশের আর একটি বিজ্ঞাপনে ব্রজবাবুর চোখ পড়ে। সাধারণ নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন, কিন্তু পুরস্কারের বহর একেবারে পাঁচ হাজার টাকা! জোয়ান বয়সের একটি ছেলের ছবির নীচে সেই মামুলী ভাষায় বিজ্ঞপ্তি—'এই নিরুদ্দিষ্ট ছেলেটির সন্ধান বক্স-নম্বর···তে পৌঁছে দিলে পাঁচ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার।'

লুব্ধ দৃষ্টিতে ছবিটির দিকে ব্রজবাবু তাকিয়ে আছেন, এমন সময়—হ্যাঁ, ঠিক সেই আশ্চর্য মুহূর্তেই ঘরে যে ছেলেটি এসে ঢোকে, তার দিকে ফিরে ব্রজবাবু একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান! নিজের চোখকেই তাঁর বিশ্বাস হয় না। এও কি সম্ভব! দুরু-দুরু বুকে তিনি আর একবার খবরের কাগজের ছবিটার ওপর ভালো করে চোখ বুলিয়ে নেন, তারপর ছেলেটিকে তন্নতন্ন করে পর্যবেক্ষণ করেন। না, কোনো ভুলই নেই—এমন কি ডানদিকের কপালের কাটা দাগটা পর্যন্ত।

ছেলেটি তখন তাঁর কাছেই একটা চেয়ারে বসে একটা খবরের কাগজ টেনে পড়তে শুরু করেছে। এমন সুযোগ জীবনে আর দু'বার আসে না। ব্রজবাবু আর দ্বিধা না করে পাশে সরে যান এবং একটু ইতস্ততঃ করে যথাসম্ভব মধুরকণ্ঠে আলাপ শুরু করেন—"আপনাকে তো আগে দেখিনি।"

ছেলেটি অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির বলে মনে হয়। ব্রজবাবুর দিকে না তাকিয়ে বলে—"আমিও আপনাকে দেখিনি।"

ব্রজবাবু দমবার পাত্র নন, বলেন—"তা—তা বটে। তা এখানে বুঝি কাগজ পড়তে এসেছেন ?"

জবাব আসে—"না, চাকরির বিজ্ঞাপন দেখতে।"

"চাকরি! আপনি কি চাকরি খুঁজছেন নাকি ?"

এবার ছেলেটি ব্রজবাবুর দিকে ভ্রূকুটি করে তাকায়—"হ্যাঁ খুঁজছি, দেবেন নাকি একটা ?"

ব্রজবাবু একটু বুঝি হকচকিয়ে যান। তক্ষুণি কিন্তু সামলে নিয়ে বলেন—"তা চাকরি একটা চেষ্টা করলে কি আর দেওয়া যায় না ?"

কথাটা খুব নীচু-গলাতেই ব্রজবাবু বলবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কেমন করে টেবিলের ওধারে ক'জনের কানে সেটা গেছে দেখা যায়। একজন বলে ওঠে—"ব্রজবাবু আজকাল চাকরি বিলোচ্ছেন নাকি ?"

পাড়ার চাঁদা-চাওয়া এই ফাজিল ছেলেগুলোকে ব্রজবাবু দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, কিন্তু তখন বাজে ঝগড়ায় সময় নষ্ট করা চলে না।

"না না, এই বলছিলাম !"—বলে একটু হেসে সে-প্রসঙ্গে দাঁড়ি টেনে ব্রজবাবু আবার তাঁর নতুন শিকারের প্রতি মনোযোগ দেন—"তা আপনি থাকেন কোথায় ?"

"কোথায়ও না, যখন যেখানে সুবিধে হয়।"

ব্রজবাবুর নাড়িটা ডবল কদমে চলতে শুরু করে। সহানুভূতিতে একেবারে গলে গিয়ে তিনি বলেন—"জানাশোনা কেউ নেই বুঝি এখানে ? ভারী দুঃখের কথা তো !"

চাঁদা-চাওয়া ফাজিল ছেলেদের একজন বলে ওঠে—"অত যদি দুঃখ, তা হলে ভদ্রলোককে আপনার বাড়ীতেই জায়গা দিন না দু'দিন।"

ফাজিল ছেলেটাকে এবার ব্রজবাবুর আশীর্বাদ করতে ইচ্ছে হয়! কথাটা

একেবারে লুফে নিয়ে তিনি বলেন—"তা কি আর দিতে পারি না! বিপদের দিনে লোককে যদি জায়গা দিতে না পারলাম, ত' বাড়ী-ঘর আছে কি জন্যে?"

খানিকক্ষণ সমস্ত ঘর একেবারে স্তব্ধ, স্তম্ভিত। দেয়ালের টিক্‌টিকিটার নাকের কাছ দিয়ে একটা সুস্পষ্ট মাছি অকুতোভয়ে হেঁটে চলে যায়।

সে অস্বাভাবিক স্তব্ধতা নিজেই একটু সলজ্জ হাস্যে বিচূর্ণ করে ব্রজবাবু বলেন —"কিন্তু উনি কি আর তা থাকবেন?"

"সুবিধে হলেই থাকতে পারি"—ছেলেটি তাচ্ছিল্যভরে জানায়, কিন্তু ব্রজবাবু হাতে স্বর্গ পান।

সেইদিন সকাল থেকেই পাঁচ হাজার টাকার সেই রত্নটি অর্থাৎ শিশির ব্রজবাবুর বাড়ীতে অধিষ্ঠিত। ব্রজবাবু শিশিরকে বাড়ীতে তুলেই খবরের কাগজের বক্স-নম্বরের ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন—এক মুহূর্তও বিলম্ব করেননি। পাঁচ হাজার টাকা সিন্দুকে তুলতে আর কতক্ষণই বা বাকি; কিন্তু সেই ততক্ষণই শিশিরকে ধরে রাখা যে এমন সমস্যা হবে, কে তা জানত!

সকালবেলা খেতে বসেই শিশির গোলমাল শুরু করেছে—"ছোঃ, এরকম চাল কি খাওয়া যায় নাকি! আর ঘি কোথায়?"

ব্রজবাবু সঙ্কুচিতভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, বাজারের সব ঘি-ই ভেজাল, সেই ভয়েই তিনি ঘি খাওয়া ছেড়েছেন।

"বেশ তো! মাখন গালিয়ে নিলেই পারেন, ঘি নইলে আমার খাওয়াই হয় না"—অম্লান বদনে বলেছে শিশির। তারপর এক এক করে সব রান্নারই খুঁত ধরিয়ে [illegible]য়ে দিয়েছে যে, মাছ-মাংস, তরিতরকারী দু'বেলা তার ভালোমত চাই, [illegible] সে এখানে থাকতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, রাত্রে লুচির সঙ্গে রাবড়ীর বদলে ভালো কাঁচাগোল্লা হলেও তেমন কিছু আপত্তি তার নেই।

পাঁচ হাজারের খাতিরে ব্রজবাবুকে তারপর সব বন্দোবস্তই করতে হয়েছে; কিন্তু তাতেও রেহাই আছে কি? এক এক করে শিশিরের বায়না মেটাতে নিজের শোবার ঘর, আসবাবপত্র, বিছানা ছেড়ে ব্রজবাবু পাশের ছোট কুঠরিতে এসে

উঠেছেন। যা কিছু তাঁর ব্যবহারযোগ্য কাপড়-চোপড়, সে সবে তাঁর নিজের কোন অধিকার আর নেই। শিশিরই ইচ্ছামত তার সদ্ব্যবহার করে, নেহাৎ জামাটা-জুতোটা মাপে মেলে না বলেই বোধহয় ছোঁয় না। এর ওপর রোজ তার হাত-খরচা আছে—বায়োস্কোপ-থিয়েটার যেতে—এটা সেটা কিনতে। ব্রজবাবু একবার আপত্তি জানিয়েছেন কি তৎক্ষণাৎ সে বাড়ী ছেড়ে যেতে প্রস্তুত। কাজেই ব্রজবাবু নিঃশব্দেই মন রাখতে তাঁর পুরোনো অফিসে গিয়ে একদিন শিশিরের চাকরির জন্যে সুপারিশ পর্যন্ত করে এসেছেন! মনে মনে গুমরে ব্রজবাবু শুধু দিন গোনেন। দিন গোনেন—চিঠির উত্তরটা আসার অপেক্ষায়। একবার পুরস্কারটা হাতের মুঠোয় এলে হয়। কিন্তু উত্তরটা আসতে যেন বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে! নিরুদ্দিষ্ট ছেলের জন্যে অমন ব্যাকুল বিজ্ঞাপন যারা দেয়, তাদের জবাবটা আরো একটু চট্‌পট্‌ আসা উচিত ছিল না কি?

ব্রজবাবুর হিসেব ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। দেখা যায়—খাই-খরচা, এমন কি চুরুটের দামটাও ধরে শিশিরের জন্যে এ পর্যন্ত খরচা হয়েছে—একশো তিয়াত্তর টাকা সওয়া তের আনা। সুতরাং এখনও চার হাজার আটশো ছাব্বিশ টাকা পৌনে তিন আনা ব্রজবাবু লাভ বলে ধরতে পারেন! কিন্তু শিশিরকে আর কিছুদিন এমন করে রাজার হালে রাখতে হলে সে লাভ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, ভেবে ব্রজবাবু একটু বিচলিত হয়ে পড়েন।

'নাঃ, আরেকটা চিঠি বক্স-নম্বরের ঠিকানায় না পাঠালেই নয়। এমনও তো হতে পারে যে,' তাঁর আগের চিঠি ঠিক জায়গায় পৌঁছায়নি।'

ব্রজবাবু সন্তর্পণে তাঁর নিজের—আপাততঃ অবশ্য শিশিরের [illegible] দিকে পা বাড়ান। শিশির আবার আজকাল এঘরে তাঁর যখন-তখন [illegible] পছন্দ করে না, তাই এই সাবধানতা।

ব্রজবাবু সবে গিয়ে মোড়াটায় বসেছেন, এমন সময় বাইরে শিশিরেরই সাড়া পাওয়া যায়! তাড়াতাড়ি সরে পড়বার আগেই শিশির শিস দিতে দিতে ঘরে ঢুকে উৎফুল্লভাবে বলে—"ধন্যবাদ ব্রজবাবু, ধন্যবাদ।"

ব্রজবাবু বেশ একটু বিমূঢ় হয়ে পড়েন। শিশিরের এ চেহারা তাঁর কাছে একেবারে নতুন।

অবাক হয়েই তিনি জিজ্ঞেস করেন—"তুমি—মানে, ফিরে এলে যে এত তাড়াতাড়ি?"

একটা চিঠি ব্রজবাবুর নাকের সামনে দু'বার নেড়ে শিশির বলে—"না,

ব্রজবাবুর সামনে চিঠিটা ফেলে দিয়ে

এত বড় সু-খবরটা পেয়ে আর বায়োস্কোপে যেতে ইচ্ছে হ'ল না।

সু-খবর! চিঠিটার দিকে চেয়ে ব্রজবাবুর বুকটা আশায় দুলে ওঠে। হাত

বাড়িয়ে চিঠিটা ছিনিয়ে নেওয়ার প্রবল বাসনাটা দমন করে তিনি বলেন—"সুখবর! সুখবরটা কিসের?"

শিশির বলে—"এই মাত্র পিওন দিয়ে গেল।"

"এই যে দেখুন না।" ব্রজবাবুর সামনে চিঠিটা ফেলে দিয়ে শিশির বলে—"এই মাত্র পিয়ন দিয়ে গেল। যাক, চাকরিটা পাওয়ার জন্যে আপনাকেই আগে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।"

"চাকরি! ও, তুমি চাকরি পেয়েছ বুঝি?"—হতাশভাবে জিজ্ঞেস করেন ব্রজবাবু—চিঠিটায় একবার চোখ বুলিয়ে।

"হ্যাঁ, পেলাম তো আপনারই সুপারিশে। আপনারই অফিসের সেই চাকরিটা। চলে যাওয়ার আগে আপনাকে তাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

"যাওয়ার আগে!" ব্রজবাবু যেন চাবুক খেয়ে উঠে দাঁড়ান! "তুমি চলে যাচ্ছ?"

"তা যেতে হবে বৈ কি! ভাবছি—চাকরি যখন পেয়েই গেলাম, তখন মামার বাড়ীতেই গিয়ে উঠি। আর মামার বাড়ী যখন এত কাছে!"

"এত কাছে তোমার মামার বাড়ী!" ব্রজবাবু রাগে, দুঃখে, বিস্ময়ে প্রায় ফেটে পড়েন—"কই সে কথা তো আগে আমায় বলনি!"

"আপনি জিজ্ঞেস করলে ত' বলব। আমার মামাকে অবশ্য আপনি ভালো করেই চেনেন। অন্ততঃ তাঁর বাগানের তরিতরকারী তো বটেই! আমি' সূর্যবাবুর ভাগনে।"

"তুমি সূর্যবাবুর ভাগনে? তা হলে—" ব্রজবাবুর খানিকক্ষণ বাকরোধ হয়ে যায়,—"তা হলে কাগজের ওই নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনের মানে?"

"মানে আর এমন কি শক্ত! ও বিজ্ঞাপনটা আমি নিজেই দিয়েছিলাম।"

"তুমি নিজেই দিয়েছিলে!"—ব্রজবাবুর মুখ দিয়ে তারপর সত্যি আর কোনো কথা বের হয় না।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ছাড়া আর কে দেবে বলুন। আমি যে নিরুদ্দেশ, একথা আমার চেয়ে আর বেশী কে জানবে?"

ব্রজবাবুর ঠোঁট দুটো একটু নড়ে মাত্র। অর্থহীন দু'একটা অব্যয় পদ তা থেকে বের হয়।

তারই উত্তরে বিশদভাবে নিজের কথা ব্যাখ্যা করে শিশির বলে—"নিরুদ্দেশ হওয়া আশ্চর্য আর কি বলুন! এত কষ্টে লেখাপড়া শিখেও বেকার হয়ে বসে থেকে নিজের ঠিক উদ্দেশ—উদ্দেশ্যও বলতে পারেন—খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তাই ওই নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন।"

"তা হলে ওই পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার!"—এতক্ষণে ব্রজবাবুর কণ্ঠ থেকে যেন একটা অস্ফুট আর্তনাদ বের হয়।

"হ্যাঁ, পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার একটা সমস্যা বটে!" শিশির বেশ একটু চিন্তিতভাবেই বলে।—"পাঁচ হাজার টাকা ত' আর সোজা কথা নয়! অত টাকা আমি এখন পাব কোথায়? তবে টাকাটা যোগাড় করতে পারলেই আমি দিয়ে দেব ঠিক করেছি। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে ঠিক করেছি যে, টাকাটা আমি নিজেকেই দিয়ে দেব। কারণ, সত্যি কথা বলতে গেলে আমি নিজেই নিজেকে

খুঁজে পেয়েছি। হঠাৎ এই চাকরিটা পাওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্যভাবে আবিষ্কার করে ফেলেছি নিজেকে। সুতরাং পুরস্কারটা ন্যায়তঃ আমারই প্রাপ্য। অবশ্য চাকরির জন্যে ধন্যবাদটা সম্পূর্ণ আপনারই পাওনা।"

এই চরম আঘাত ব্রজবাবুকে বসিয়ে দেয় একেবারে—শিশিরের এগিয়ে দেওয়া তাঁরই নিজের আরাম-কেদারায়।

সান্নু ও দুধরাজকুমার

কাল গেছে সান্নুর জন্মদিন। সান্নু পেয়েছে অনেক কিছু। তাঁর উপহারের বহর দেখে দাদু ঠাট্টা করে বলেছেন—"আমার যে আবার ছেলে মানুষ হতে ইচ্ছে করছে রে!"

সান্নু কিন্তু একেবারে খুশি হতে পারেনি! হ্যাঁ, ক্যামেরা একটা সে পেয়েছে বটে, তার সঙ্গে একটা এয়ার-গান্ ও বইপত্র আর অন্যান্য অনেক রকম জিনিস, কিন্তু একটা যে মস্ত বড় খুঁত রয়ে গেল। সান্নুর সে দুঃখ যাবার নয়। আজ এক মাস ধরে সে দেখছে একটা মোটর সাইকেলের স্বপ্ন। বেণুদা যে রকম মোটর সাইকেলে চড়ে আসে সেই রকম একটা তার চাই-ই। কি তার আওয়াজ আর কি তার বেগ! একেবারে ঝড়ের মত আসে সমস্ত পাড়া কাঁপিয়ে, সকলকে জানিয়ে।

এক মাস ধরে সে অমনি একটা সাইকেলের বায়না ধরেছে। বাড়ীর সবাই তখন তার কথা উড়িয়ে দিয়েছেন—"ছেলেমানুষ তুই কি এখন মোটর চালাতে পারিস্?"

না—পারে না! কেন পারে না? মোটর সাইকেল চালানটা যেন ভারী শক্ত ব্যাপার! সে ত' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেণুদার চালান দেখে সব শিখে নিয়েছে। পা দিয়ে একবার স্টার্ট দেওয়া, তারপর হ্যাণ্ডেল ধরে চালান—এ যেন আর কেউ পারে না! বেশ ত, একটা মোটর সাইকেল তাকে কিনেই দেওয়া হোক না, সে দেখিয়ে দেবে তারপর চালাতে সে জানে কিনা! সে বেণুদার চেয়েও জোরে চালিয়ে দেবে একেবারে ঝড়ের মত! বাড়ীর লোকেরই বা সুবিধা কত হবে বল দেখি! এই সেদিন বায়োস্কোপে যাবার আগে হঠাৎ দিদির যে মাথার ফিতে হারিয়ে গেল—তারপর খুঁজতে খুঁজতে এমন দেরী হয়ে গেল যে বায়োস্কোপে পৌঁছে কতগুলো ছবি দেখাই হ'ল না। তার একটা মোটর সাইকেল থাকলে কি আর এমন হ'ত? "দাঁড়াও দাঁড়াও তোমাদের ভাবতে হবে না" বলে সে একেবারে সাইকেলে গিয়ে

উঠত, তারপর একেবারে নিউ মার্কেট, চক্ষের নিমেষে ফিরে এসে দিদির হাতে ফিতে দেওয়া। তখন অবাক হয়ে বলত সবাই কিনা—"কিরে এরি মধ্যে ফিরে এলি!"

নাঃ সাইকেল তার একটা চাই-ই। কিন্তু বাড়ীর লোকেরা ভারী অবুঝ। সান্তুকে তাদের সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া করতে হয়েছে, শেষকালে অনেক কান্নাকাটির পর কাকা বলেছিলেন—"আচ্ছা তোর জন্মদিন আসছে, তখন দেখা যাবে।"

সান্তু সেই ভরসাতেই ছিল। ক্লাসের ছেলেদের ইতিমধ্যে সে সুসংবাদটা জানিয়েও দিয়েছে, কিন্তু কাকা এমন মিথ্যুক কে জানত! জন্মদিনে তার সব হয়েছে, কিন্তু মোটর সাইকেল কই? কাকা তাকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বলেছেন যে সে ছোট কিনা, তাই তার জন্যে মোটর সাইকেল ছোট করে তৈরীর বায়না দেওয়া হয়েছে—শীগগির আসবে। আহা, সান্তু যেন বোকা, কিচ্ছুই বোঝে না! মোটর সাইকেল ত' ছোটই হয়। বেণুদা যে অত বড়, তার সাইকেল থেকেও ত' সান্তুর পা মাটিতে পড়ে! না—সবাই তাকে বড্ড ছেলেমানুষ ভাবে।

সব জিনিসের ভেতর ক্যামেরা আর এয়ার-গান্‌টি পাশে নিয়ে উপহারের একটা গল্প-বই খুলে সান্তু বিছানায় শুয়ে পড়ছিল—পড়ছিল আর মাঝে মাঝে ভাবছিল সাইকেলের কথা। এমনি করে কখন সে যে ঘুমিয়ে পড়ল সে জানে না। হঠাৎ ঘুম ভেঙেই দেখল সকাল হয়েছে! রাতটা যেন বড় শীগগির কেটে গেছে।

বিছানা থেকে ঘুম-চোখ নিয়ে সে উঠেই দেখে কাকা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। কাকা বললেন—"তোর জন্যে কি এনেছি বল দেখি!"

"কি কাকামণি?"

"আয় দেখবি আয়—" বলে কাকা তাকে বাইরে নিয়ে গেলেন।

বাইরে বেরিয়ে সান্তু ত অবাক! নিজের চোখকেই আর বিশ্বাস হয় না। সত্যিকারের একটা মোটর সাইকেল একেবারে গেটের ধারে দাঁড় করান। কাকা ত' তা হলে মিথ্যে বলেনি। সত্যিই মোটর সাইকেলটা ছোট—বেণুদার সাইকেলটার চেয়ে অনেক ছোট—আর কি সুন্দর! রূপোর মত ঝক্‌ঝক করছে তার যন্ত্রপাতি। সান্তু আনন্দে চীৎকার করে উঠে একেবারে লাফিয়ে গিয়ে তাতে চড়ে বসল।

❋ প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাসির গল্প ❋

মোটর সাইকেলটাও কি অদ্ভুত! একবার পা ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে দে ছুট। সান্নু যেন হ্যাণ্ডেলটা বাগিয়ে ধরে রাখতেই পারে না। তার কানের পাশ দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে হু-হু করে, বাড়ী ঘর সব সরে যাচ্ছে বায়োস্কোপের ছবির চেয়েও তাড়াতাড়ি, আর রাস্তাটা? সেটা যেন হয়ে গেছে একটা দুরন্ত নদী—তর্‌তর্‌ করে পায়ের তলা দিয়ে বয়ে চলেছে।

আশ্চর্য! দেখতে দেখতে এ কোথায় এসে পড়ল সান্নু! কখন সে শহরের বাড়ীঘর ছাড়িয়ে এসেছে বুঝতেও পারেনি। চারিধারে এবার ধূ-ধূ করছে মাঠ! যত দূর দৃষ্টি যায় গাছপালা কোথাও কিচ্ছু নেই—খালি, থেকে থেকে ঘূর্ণি হাওয়ায় এখানে সেখানে উড়ছে শুকনো ধূলো আর বালি।

সান্নু হঠাৎ মোটর সাইকেল থামিয়ে ফেলল। সেই শূন্য দিগন্ত-জোড়া মাঠের মাঝখান দিয়ে একটি ছেলে হেঁটে চলেছে। সান্নু তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে যেন চমকে উঠল। সান্নু জিজ্ঞাসা করলে—"এ কোন্‌ জায়গা বলতে পার ভাই?"

ছেলেটি তার দিকে একটু অবাক হয়ে চেয়ে বললে—"এ হ'ল তেপান্তরের মাঠ।"

তেপান্তরের মাঠ! সান্নুর মনে হ'ল জায়গাটার কথা সে যেন কোথায় শুনেছে। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই তার চোখ পড়ল ছেলেটার পোশাকের ওপর। সত্যি, ছেলেটির পোশাক ভারী অদ্ভুত, মাথায় তার পালক ওড়ানো, জরির কাজ করা উষ্ণীষ, কাঁধ থেকে বুকের ওপর বাঁকা করে বাঁধা রঙীন উড়ানি। কোমরে বাঁধা একটা লম্বা তলোয়ার—তার কাপড় পরবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত আলাদা।

সান্নু বললে—"তোমার নাম কি ভাই?"

"আমার নাম দুধরাজপুত্র।"

দুধরাজপুত্র নামটাও সান্নুর একেবারে অচেনা মনে হ'ল না। জিজ্ঞেস করলে —"তুমি যাচ্ছ কোথায়?"

"আমি যাব অনেক দূর। তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচির দেশে!"

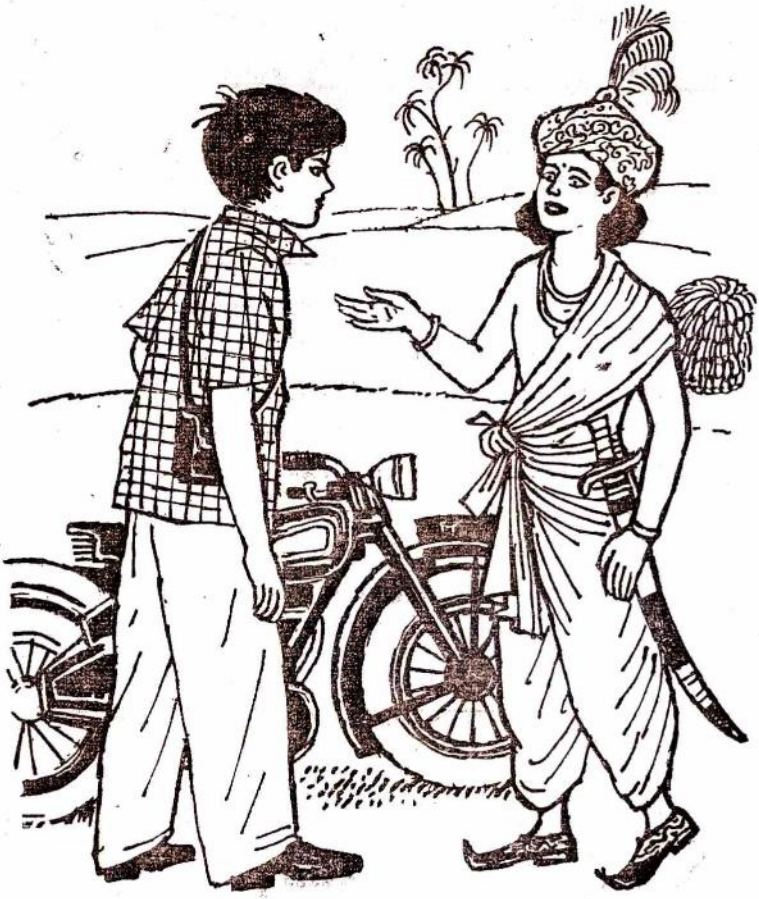

"আমি যাব অনেক দূর,...বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচির দেশে"

সান্তু খানিক গম্ভীর হয়ে কি ভেবে নিয়ে বললে—"এমন করে হেঁটে হেঁটে ক'দিনে পোঁছাবে সেখানে ?"

দুধরাজপুত্র বললে—"ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, পায়ে ফোস্‌কা, মাথায় ধূলো, যদি হাঁটতে পারি সাত দিন সাত রাত, তবে পৌঁছব সেখানে।"

সান্নু হেসে বললে—"দূর্, তুমি যেমন বোকা! এস দিকি আমার গাড়ীতে, দেখতে দেখতে তোমায় সেখানে নিয়ে যাব।"

দুধরাজপুত্র কেমন একটু আড়ষ্টভাবে এসে মোটরের পেছনে চড়ে বসল। কিন্তু সান্নু যেই স্টার্ট দিয়েছে অমনি সে আঁতকে উঠে সান্নুকে ধরল জড়িয়ে। সান্নুর সাইকেল তখন ঝড়ের মত তেপান্তরের মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে! দুধরাজপুত্র ভয়ে ভয়ে বললে—"এ-কি ভাই? পক্ষিরাজে চড়েছি। সে ওড়ে, কিন্তু এমন ছুটে ত' চলে না, এমন আওয়াজও ত' নেই!"

"ভয় নেই, ভয় নেই—এ হ'ল মোটর সাইকেল সিক্‌স হর্স পাওয়ার, নতুন মডেল! ঘণ্টায় ষাট মাইল চলেছে কিনা এখন। তাই আওয়াজ একটু বেশী—"

দুধরাজপুত্র বললে—"লাগামটা আর একটু টেনে ধর না ভাই, আর একটু আস্তে চলুক।"

"আস্তে! আস্তে কেন? আরো জোরে বল! ফুল্ স্পীড দিইনি।"

সান্নু আর একটু বেগ বাড়িয়ে বললে—"কোথায় তুমি যাচ্ছ বললে—কি কাঁকুড়ের দেশে না?"

"হ্যাঁ, বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচির দেশে।"

"তোমার বুঝি এগ্রিকাল্‌চারে ঝোঁক? আমার সেজদারও ভাই তাই—এবার সাবোরে যাবে পড়তে।"

দুধরাজপুত্র অবাক হয়ে চুপ করে রইল। সান্নু আবার জিজ্ঞেস করলে—"কি করবে সেখানে?"

সেখানে আছে কুঁচবরণ রাজকন্যা মেঘবরণ চুল—দিনে একবার সে ছাদে চুল শুকোয়—আর তার ছায়া পড়ে—নিমেষের তরে নদীর জলে। সেই ছায়া দেখে আমায় আঁকতে হবে তার হুবহু ছবি। ভুল হবে না—চুক হবে না!"

সান্নু বললে—"তারপর?"

তারপর যেতে হবে সেই ঘুমন্ত পুরীতে, যেখানে স্ফটিকস্তম্ভের ভেতর হীরের কৌটোয় আছে সাতশো রাক্ষসীর গোপন প্রাণ-ভোমরা! সেখানে সহস্রদল পদ্মের বিছানায় চোখ চেয়ে ঘুমিয়ে আছে আমার দাদা ফুলরাজকুমার। আমার ছবি যদি নিখুঁত হয় তবে তার দিকে চেয়ে সে উঠবে জেগে, এক চুল এদিক ওদিক হলে চির দিনের মত তার চোখ যাবে বুজে।"

সান্থ হেসে বললে—"এই!"

রাজকুমার পেছন থেকে চটে উঠে বললে—"এই মানে? কাজটা তুমি ছেলে-খেলা ভাবছ নাকি?"

"তা ছাড়া কি?"

রাজকুমার গুম্ হয়ে চুপ করে রইল। বোঝা গেল সে চটেছে। সান্থ আর খানিক মোটর-সাইকেল চালিয়ে বললে—"দেখ দিকি তোমার কাঁকুড়ের দেশে এলাম কিনা! দূরে যেন কটা নার্শারির সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে।"

মোটর থামতেই দুধরাজকুমার অবাক হয়ে নেমে বললে—"তা হ'ক! এত তাড়াতাড়ি পৌঁছালাম কি করে?"

সান্থ গর্বভরে বললে—"বললাম না তোমায় সিক্স হর্স পাওয়ার, নতুন মডেল গাড়ী আমার! আর সত্তর মাইল স্পীড্ ঘণ্টায় কম হ'ল নাকি?"

হঠাৎ দুধরাজকুমারের মুখ গেল ম্লান হয়ে, বললে—"কিন্তু এত আগে এসে কোন লাভ হ'ল না ভাই!"

"কেন?"

"সাত দিন সাত রাত্রে আমার আসবার কথা—আগে এলে চলবে কেন?"

সান্থ খানিক হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে—"তুমি পাগল নাকি? সাত দিনের জায়গায় আমি যদি সাত মিনিটে আসি তাতে কার কি? তুমি চল দেখি, দেখিয়ে দেবে কোথায় তোমার সেই কুঁচবরণ কন্যা চুল বাঁধে!"

দুধরাজপুত্র আর কি করে, একান্ত অনিচ্ছায় সে যেন চলল। যেতে যেতে বললে—"এত আগে এলাম, রাজকন্যা চুল বাঁধতে এখন এলে হয়।"

"বাঃ! এই-না তুমি বললে রাজকন্যা রোজ চুল বাঁধে?"

"কিন্তু আমি সাত দিন সাত রাত হেঁটে এলে তবে ত!"

সান্নু একটু বিরক্ত হয়ে বললে—"তুমি কেমন করে এলে না এলে তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? তুমি আজই আস আর সাত দিন বাদেই আস, রাজকন্যা চুল ত' বাঁধবে! তোমার ঘুম পায়নি বলে এদেশে রাত হবে না নাকি?"

"তা নাও হতে পারে। আমাদের এখানকার ব্যাপার তুমি বুঝবে না ভাই!"

সান্নু এবার একটু রেগেই চুপ করে রইল। দু'জনে তখন নদীর ধারে শ্বেত-পাথরের রাজপুরীর কাছে এসে পড়েছে। দুধরাজপুত্র কাগজ তুলি রঙ বার করে ভয়ে ভয়ে বললে—"যদি বা রাজকন্যা আসে, নদীর জলে আজ যা ঢেউ দিয়েছে ভাঙা ছায়া দেখে ঠিক আঁকতে পারব কিনা কে জানে!"

সান্নু মোটর সাইকেল থেকে কি একটা জিনিস এনে হেসে বললে—"আচ্ছা আচ্ছা; সে ভাবনা তোমার নেই।"

তারপর দু'জনে নদীর ধারে রইল বসে, রাজপুত্র চেয়ে আছে নদীর জলে—সান্নু ওপরের দিকে। খানিক বাদে দুধরাজপুত্র হঠাৎ কাতরভাবে বলে উঠল—"ওই যাঃ—"

"কি হ'ল কি?"

"রাজকন্যার ছায়া পড়ল, কিন্তু জলের ঢেউএ দেখতেই পেলাম না ভালো করে। এখন উপায়?"

সান্নু হেসে বললে—"কিছু ভয় নেই, ঠিক স্ন্যাপ নিয়েছি। ইন্‌স্টান্‌টেনিয়াস এক্‌সপোজার!"

রাজপুত্র হাঁ করে তার দিকে চেয়ে রইল।

সান্নু বললে—"রাজপুরীর আস্তাবলটা বেশ অন্ধকার মনে হচ্ছে। চল ওখান থেকে ডেভেলপ করে নিয়েই তোমার দাদার দেশে যাব।"

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই দেখা গেল সান্নু আর দুধরাজপুত্র সাইকেলে চলেছে আর একদিকে।

সান্থ বললে—"বেশ আলো আছে ; পথে যেতে যেতেই প্রিণ্ট হয়ে যাবে। ঘুমন্ত পুরীতে গিয়েই ফিক্‌স্ করে নেব'খন।"

রাজপুত্র অনেকক্ষণ ধরে কোন কথা বলেনি, এখনও সে চুপ করে রইল।

ঘুমন্ত পুরী পৌঁছাতে বেশীক্ষণ লাগল না। রাস্তায় ট্রাফিক নেই—ডাইনে বাঁয়ের হাঙ্গাম নেই। একেবারে স্ফটিকপ্রাসাদের ভেতর নিয়ে সান্থ মোটর সাইকেল থামালে। তারপর তর্‌তর করে দু'জনে উঠল সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়ি বড় কম নয়, শেষ আর হতে চায় না। সান্থ একটু রেগে বললে—"একটা লিফ্‌ট থাকা উচিত ছিল!"

যাই হোক সিঁড়ি শেষ হ'ল। এবার মস্ত বড় একটা ঘর। ঘরের চারধারে বাতি জ্বলছে লাল নীল হলদে আর তার মাঝখানে সহস্রদল পদ্মের ওপরে শুয়ে আছে ফুলরাজকুমার।

সান্থ এবার বসল ছবি ফিক্‌স করতে আর দুধরাজকুমার জানালায় রইল পাহারায়—সাতশো রাক্ষুসী না এসে পড়ে!

ছবি ঠিক হতেই সান্থ দুধরাজকুমারকে ডেকে বললে—"দেখ দিকি!"

দেখে দুধরাজকুমার ত' অবাক। দু'জনে মিলে এবার ছবি নিয়ে গিয়ে ধরল ফুলরাজকুমারের সামনে। যেমনি ধরা অমনি, ঘরের লাল নীল বাতি গেল নিভে ; সহস্রদল পাপড়ি গেল মুদে। ফুলরাজকুমার জেগে উঠে বললে—"হাইপো একটু বেশী হয়ে গেছে।"

সান্থ কুণ্ঠিতভাবে বললে—"কি করব! যা তাড়াতাড়ি!"

ফুলরাজকুমার তার পিঠ চাপড়ে বললে—"তা হোক! তোমার বাহাদুরী আছে। কিন্তু এখন সাতশো রাক্ষুসীর প্রাণ-ভোমরা যে মারতে হবে।"

সবাই মিলে গেল স্ফটিকস্তম্ভের দীঘিতে। সান্থ এক ডুবে তুলল স্ফটিকস্তম্ভ। ফুলরাজকুমার এক আছাড়ে তা ভাঙল, কিন্তু কৌটো খুলে দুধরাজকুমার যেই তরোয়াল বার করে যাবে কাটতে, তার তরোয়াল গেল খাপে আটকে। ভোমরা কৌটো থেকে বেরিয়ে উড়ল।

দুধরাজকুমার আর ফুলরাজকুমার ভয়ে কেঁদে কেলল। কিন্তু সান্থ নির্বিকার, এয়ার-গান্‌টা ছিল সঙ্গে আর সাতশো রাক্ষুসীর প্রাণ-ভোমরা নেহাৎ ছোটখাটো নয়—প্রায় একটা চড়ুই পাখীর মত। সান্থ বন্দুক উঠিয়ে এক ছর্‌রায় প্রাণ-ভোমরাকে দিলে মেরে।

সান্থ বন্দুক উঠিয়ে এক ছর্‌রায় প্রাণ-ভোমরাকে দিলে মেরে

তারপর হাঁউ মাঁও খাঁউ। সাতশো রাক্ষসী আসছে ছুটে বন-বাদাড় মাঠ-ঘাট পার হয়ে! কিন্তু এ কি! তারা মরে না কেন?

সাতশো রাক্ষসী হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ করে ছুটে এসে বললে—"আমরা কখ্‌খনও মরব না, কিছুতেই মরব না ত!"

"বাঃ মরবে না কি রকম? তোমাদের প্রাণ-ভোমরাকে ত' মেরে ফেলেছি!"

"না ও মারা ত' সই নয়। কথা ছিল এক কোপে কাটবে, এক ফোঁটা রক্ত পড়বে না ভুঁয়ে। এয়ার-গানে মারলে কেন?"

এইবার লাগল গণ্ডগোল। সাতশো রাক্ষুসী প্রাণপণে চেঁচায় আর বলে—"কখ্‌খনও মরব না! এয়ার-গান্ মারা সই নয়।"

আর এরা তিনজন বলে—"আলবৎ মরবে। তোমাদের প্রাণ-ভোমরা মেরে ফেলেছি!"

সোরগোল ক্রমেই বেড়ে উঠল। সাতশো রাক্ষুসীর চীৎকারে কান ঝালাপালা, তালা লাগবার যোগাড়!

সান্তু শব্দের চোটে অস্থির হয়ে হঠাৎ জেগে উঠল। ওমা, এ কি সত্যি যে সকাল হয়েছে। বাইরে বেণুদার মোটর সাইকেলটার আওয়াজ।

অপরূপ কথা

মস্তবড় রাজা—

একালের নয়, সেকালের। সুতরাং লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত, হাতী-ঘোড়া বিস্তর—তার আর লেখাজোখা নেই।

রাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যেতে সারাদিন লেগে যায়। অবশ্য একটু বেলা করে বেরোতে হয়। মাঝে ঘণ্টা আষ্টেক জিরিয়েও নিতে হয় বই কি!

হাতীশালে হাতী—হাতী ছিল, আপাততঃ মরে গেছে। ঘোড়াশালে ঘোড়া আছে। বুড়ো হয়ে বাতে আর চলতে পারে না, কিন্তু তা হোক, চিঁহি চিঁহি ডাকে—খাবার না পেলে।

লোক-লস্কর ত' বলেছি লেখাজোখা নেই। হাঁক দিলে অমন পিল-পিল করে পাঁচজন বেরিয়ে পড়তে পারে,—সব সময়ে অবশ্য বেরোয় না। মাস কয়েক মাইনে না পেয়ে একটু বেয়াড়া হয়ে পড়েছে।

সুতরাং মস্ত বড় রাজা।

রাজার জমকালো দরবার। মন্ত্রী, কোটাল, পাত্র-মিত্র, প্রহরী প্রভৃতি রাজাকে আসর জমিয়ে বসে থাকে। প্রভৃতি অবশ্য একজন ছোকরা চাকর। তাকে নিয়ে হ'ল ছ'জন।

মন্ত্রী সব সময়ে থাকতে পারেন না, মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে তাঁকে বাজার-টাজার করে আনতে হয়। কোটাল রান্না চড়িয়ে সময় পেলেই কিন্তু এসে বসে। পাত্র-মিত্র ঠায় বসে থাকেন। তাঁদের একজনের বাত, একজনের হাঁফানি—দরবারের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করলে বাড়ে।

রাজসভায় রাজকার্য চলে সারাদিন।

গোমড়ামুখে সবাই বসে থাকেন। রাজা থেকে থেকে পিঠের জামা তুলে ডাকেন—"মন্ত্রী!"

ব্যস্, আর কিছু বলতে হয় না। মন্ত্রী বজ্রগম্ভীর হাঁক দিয়ে ডাকেন—"প্রহরী!"

প্রহরী এসে লম্বা কুর্নিশ করে ট্যাঁক থেকে ঝিনুক বার করে দেয়।

মন্ত্রী রাজার পিঠ চুলকে দেন।

খানিক বাদে রাজা বলেন—"হুঁ!"

মন্ত্রী চুলকান থামিয়ে প্রহরীর হাতে ঝিনুক ফিরিয়ে দেন। প্রহরী আবার কুর্নিশ করে ঝিনুক ট্যাঁকে গুঁজে নিজের জায়গায় ফিরে যায়।

আবার সব চুপচাপ।

খানিক বাদে রাজা মন্ত্রীর দিকে কট্‌মট করে তাকিয়ে বলেন—"মন্ত্রী!"

কাঁপতে কাঁপতে মন্ত্রী বলেন—"হুজুর!"

"তোমার গর্দান যাবে, জান?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কেন জান?"

"আজ্ঞে না।"

রাজা ধমক দিয়ে বলেন—"কি? জান না?"

মন্ত্রী শশব্যস্ত হয়ে বলেন—"আজ্ঞে জানি।"

"বল·কেন?"

মন্ত্রী আমতা-আমতা করেন।

রাজা ধমক দিয়ে বলেন—"অকর্মণ্য গাধা! এত বড় একটা রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে কেন তোমার গর্দান যাবে তা তুমি বলতে পার না?"

মন্ত্রীর হঠাৎ বুদ্ধি খুলে যায়, বলেন—"হুজুর, এত বড় রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে এই সামান্য কথা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব? এ হ'ল কোটালের কাজ।"

রাজা বলেন—"হুঁ, ঠিক বলেছ। বল কোটাল।"

কোটাল কানে একটু খাট, শুনতে পায় না। মাথা নীচু করে নিজের মনে বিড়-বিড় করে।

রাজা আবার হাঁক দেন—"কোটাল !"

এবার কোটাল শুনতে পায়, লাফ দিয়ে উঠে কুর্নিশ করে বলে—"হুজুর !"

"কেন মন্ত্রীর গর্দান যাবে ?"

কিন্তু তাতে হয় না। অগত্যা কোটালের কানটা ধরে কাছে টেনে মন্ত্রীকে চেঁচিয়ে বলতে হয়—"কেন আমার গর্দান যাবে রাজা জিজ্ঞাসা করছেন।"

এক গাল হেসে এবার কোটাল বলে—"আজ্ঞে, এর আগেই ওর গর্দান যাওয়া উচিত ছিল ; ওর মুখখানা যা বিশ্রী !"

মন্ত্রীর চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে।

রাজা বলেন—"চোপ, হ'ল না।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলে কোটাল থপ্ করে বসে পড়ে।

রাজা বলেন—"যে বলতে পারবে, তার বকশিশ মিলবে, ভুল হলে গর্দান !"

সবাই সবার মুখের পানে চায়, কেউ রা করে না।

রাজা এক এক করে জিজ্ঞাসা করেন। কেউ কথা কয় না। সব শেষে ডাক পড়ে ছোকরা চাকরের।

ছোকরা চাকর একা একাই মেজেয় বসে তাস নিয়ে পেটাপিটি খেলে। রাজার ডাকে মুখ না তুলেই বলে—"আজ্ঞে চুলকোন বেশী হয়েছে, আপনার পিঠ জ্বালা করছে।"

"ঠিক।"

সবাই মাথা নেড়ে বলে—"ঠিক, হতভাগা আগে না বললে আমরাও বলতে যাচ্ছিলুম।"

রাজা বলেন—"নাও বকশিশ।"

ছোকরা মাথা না তুলেই বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেয়। রাজা এ পকেট ও পকেট খুঁজে শেষকালে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা আস্ত টাকা বার করে দেন।

ছোকরা চাকর সেটা ঠং করে মাটিতে ঠুকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে—"এটা অচল।"

এক গাল হেসে এবার কোটাল বলে—"আজ্ঞে, এর আগেই ওর গর্দান যাওয়া উচিত ছিল ; ওর মুখখানা যা বিশ্রী!" [৫১ পৃঃ]

রাজা টাকাটি আবার পকেটে পুরে বলেন—"আচ্ছা, কাল নিও।"

তারপর আবার চুপচাপ।

রাজার স্মরণশক্তি অত্যন্ত বেশী। ঘণ্টা কয়েক বাদে মন্ত্রীর দিকে চেয়ে বলেন—"তোমার না গর্দান যাবে?"

"আজ্ঞে যাবে বই কি! তবে আজকে ত' কোথায়ও যাত্রা নাস্তি।"

"বেশ, কিন্তু কাল যেন মনে থাকে!"

খানিক বাদে রাজা হাই তুলে বলেন—"ব্যস্, আজকের মত সভাভঙ্গ।"

এমনি করে রাজ্য শাসন চলে। রাজার দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। অবশ্য বাঘ জল ছাড়া আরো কিছু খায়। চোর-ডাকাত রাজ্যের ত্রিসীমানায় ঘেঁসে না। তাদের মজুরী পোষায় না।

এহেন সুখের রাজ্যে একদিন ঘটল এক বিপদ।

রাজা সভায় বসে আছেন। মন্ত্রী গেছেন বাজারে, কোটাল রান্নাঘরে; ছোকরা চাকর এসে পৌছয়নি। এমন সময় প্রহরী কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে বললে—"হুজুর, দূত এসেছে।"

রাজার ঘুম এসেছিল। চোখ বুজে বললেন—"গর্দান নাও।"

"হুজুর, দূত।"

রাজা বললেন—"দুত্তোর!"

মন্ত্রী ততক্ষণে বাজার-টাজার সেরে পোঁটলা হাতে সভায় এসে পৌছেছেন। ব্যাপার বুঝে একটু গলা চড়িয়ে বললেন—"হুজুর, দূত যে অবধ্য।"

"অবাধ্য হলে ত' আর কথাই নেই, আগে মাথা নাও।"

রাজার বিদ্যের বহর স্মরণ করে মন্ত্রী বললেন—"আজ্ঞে দূতকে যে মারতে নেই, শাস্ত্রে বলে—আর তা ছাড়া ও যে রামনগরের দূত!"

রাজার ঘুম-টুম উবে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে সভয়ে বললেন—"য়্যাঁ, রামনগরের দূত, কোথায়? শুনতে-টুনতে পায়নি ত! রামনগরের রাজাটা যা গোঁয়ার আর চোয়াড়, এক্ষুনি যুদ্ধ বাধিয়ে বসবে—একটা ছুতো পেলে হয়!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, শুনেছি তাঁর পুরানো তরোয়ালটায় শাণ দেবার পর থেকে তিনি সেটার ধার পরীক্ষা করার জন্যে উস্‌খুস করছেন।"

"তাই নাকি? আর তোমরা তার দূতকে রেখেছ বসিয়ে? দেখ আবার কি ফ্যাসাদ বাধিয়েছে!"

ছোকরা চাকর ততক্ষণে এসে পড়েছে। দূতকে ডেকে এনে সেই হাজির করে দিলে।

দূত এসে কুর্নিশ করে বললে—"হে রাজন্!"

রাজা আঁতকে উঠে বলে ফেললেন—"য়্যাঃ!"

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্যে তাঁর কানে কানে বলে দিলেন—"আজ্ঞে ভয় নেই, ওদের ওই রকম বলাই দস্তুর।"

দূত তখন বলে চলেছে—"শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীল শ্রীযুক্ত পরমপরাক্রান্ত সসাগরা ধরণীর অধিপতি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিলোকের পালক, চন্দ্র-সূর্য যাঁহার মার্বেল-গুলি, নক্ষত্রমণ্ডলী....."

রাজা ফ্যাল-ফ্যাল করে একবার সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি কানে কানে বললেন—"একটু সবুর করুন মহারাজ, আর একটুখানি বাকি।"

"যাঁহার ঝাড়-লণ্ঠন, হিমালয় যাঁহার ইঁটের পাঁজা, নদীসমুদ্র যাঁহার নালা-ডোবা, সেই মহামহিম অজর অমর অজেয় রামনগরের মহারাজার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া এই পত্র আপনাকে প্রদান করিলাম।"

দূত রাজার হাতে একটি চিঠি দিলে।

রাজার মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল, বললেন—"তাই বল, চিঠি এনেছে, আমি ভাবি কি না ব্যাপার?"

তার পরেই রাজা মুখ গম্ভীর করে এ পকেট ও পকেট হাতড়ে বললেন—"এই যাঃ, চশমাটা ত' ফেলে এসেছি। নাও পড় ত হে মন্ত্রী।"

মন্ত্রী এর মধ্যে বাজারের পোঁটলা হাত সাফাই করে সিংহাসনের তলায়

লুকিয়ে ফেলেছেন। চিঠি হাতে নিয়ে তিনিও একবার এ পকেট ও পকেট হাতড়ে বললেন—"আজ্ঞে আমিও দেখছি চশমাটা আনিনি। পড় হে কোটাল, তোমার ত খুব চোখের জোর।"

মন্ত্রীর দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে কোটালকে বাধ্য হয়েই চিঠিটা নিতে হয়। তার পর উল্টে পাল্টে, একবার কাছে একবার দূরে—নানা রকমে ধরেও কোটালের চিঠি পড়া আর হয় না।

রাজা ধমক দিয়ে বললেন—"কই হে—পড় না, ভারী ত একটা চিঠি, তাই পড়তে দিন কাটাবে নাকি? নেহাৎ চশমাটা ফেলে এসেছি, থাকলে দেখিয়ে দিতাম!"

কোটাল কাঁচুমাঁচু হয়ে বললে—"পড়তে ত এক্ষনি পারি। কিন্তু এর যে আগাগোড়া ব্যাকরণ ভুল। এমন অশুদ্ধ ভাষা কেমন করে মুখ দিয়ে বার করব?"

ছোকরা চাকর এতক্ষণ একধারে দাঁড়িয়ে পান চিবুচ্ছিল। তাড়াতাড়ি চিঠিটা টেনে নিয়ে বললে—"থাক কাউকে পড়তে হবে না।"

মন্ত্রী অমনি বলে উঠলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, পড় ত বাবা, এই ত তোমাদের পড়বার বয়স!"

কোটাল সায় দিয়ে বললেন—"তোমাদের ত' অত শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার নেই। পড়লেই হ'ল।"

ছোকরা চাকর চিঠিটা মনে মনে পড়ে ফেলে বললে—"রামনগরের মহারাজ আপনার ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবে ঠিক করেছেন। তিন দিনের ভেতর রাজপুত্র নিয়ে বিয়ের জন্য রওনা না হলে রামনগর থেকে সাত হাজার সেনা তাঁকে নিতে আসবে।"

এবার সভাশুদ্ধ সকলের মুখ শুকিয়ে গেল।

রাজা ঢোঁক গিলে বললেন—"সাত হাজার! ঠিক পড়েছ ত' হে, সাত হাজার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সাত হাজার পদাতিক আর তিন হাজার ঘোড়-সওয়ারের কথাও আছে।"

"আবার ঘোড়-সওয়ারও আছে!"—রাজার প্রায় ভিরমি যাবার যোগাড়।

ভিরমি যাওয়া আশ্চর্য নয়। প্রথমতঃ রাজার ছেলেই হয়নি ত' রাজপুত্র পাঠাবেন কেমন করে? আবার না পাঠালে সাত হাজার সৈন্যের নিতে আসা মানে যে কি তাও আর বোঝা শক্ত নয়। সেকালে যুদ্ধটুদ্ধ অমনি করেই হ'ত কিনা!

রাজা মন্ত্রীর মুখের দিকে তাকান, মন্ত্রী তাকান কোটালের দিকে। পাত্র-মিত্র মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

এখন উপায়!

রাজা বার কয়েক ঢোঁক গিলে আমতা-আমতা করে বললেন—"ওহে দূত,—ওর মানে কি! বুঝেছ কিনা—অর্থাৎ···ওই যে কি বলে—বল না হে মন্ত্রী!"

"এই যে বলি মহারাজ···" মন্ত্রী একবার বেশ করে গলা খাঁকারি দিয়ে নিয়ে শুরু করলেন—"ওহে দূত, ওর মানে কি···বুঝেছ কিনা···"

দূত এতক্ষণ পর্যন্ত কিঞ্চিৎ জলযোগের আশায় থেকে থেকে এইবার তার কোন সম্ভাবনা নেই দেখে চটে গিয়েছিল, বললে—"যা বলবার তাড়াতাড়ি সেরে নিন মশাই, আমার ত' আর সারাদিন এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না—খাওয়া দাওয়া ত' আছে!"

কিন্তু এত বড় ইসারাটাও মাঠে মারা গেল।

রাজা বললেন—"নিশ্চয়ই! বল না হে মন্ত্রী, যা বলবার।"

ছোকরা চাকর এবার এগিয়ে এসে সবাইকে থামিয়ে বললে—"ওহে বাপু দূত!"

দূত চটে উঠে বললে—"ওহে:বাপু, কি হে?"

"আচ্ছা, না হয় ওহে বাছা দূত, তোমার রাজাকে গিয়ে বোলো যে রাজপুত্র গেছেন শিকারে, শিকার থেকে ফিরেই তিনি যাবেন বিয়ে করতে।"

সভাশুদ্ধ সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দূত রাগে গস্‌গস্‌ করতে করতে বলে গেল—"কিন্তু বেশী দেরী হলে আমরা নিতে আসব, মনে থাকে যেন।"

তারপর একমাস যায়, দু'মাস যায়।

রামনগর থেকে দূত এসে জিজ্ঞাসা করে—"কই রাজপুত্র শিকার থেকে ফিরল ?"

ছোকরা চাকর জবাব দেয়—"ফিরবে বই কি, এই ফিরল বলে।"

কিন্তু এমন করে আর কতদিন চলে ? রাজপুত্র আর না পাঠালে নয়।

ছোকরা চাকর বলে—"মহারাজ, রাজপুত্র খুঁজুন।"

রাজা বলেন—"ঠিক বলেছ।···প্রহরী, রাজপুত্র খুঁজে আন।"

প্রহরী এসে কিন্তু মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে—নড়ে না চড়ে না।

মন্ত্রী বলেন—"মহারাজ, রাজপুত্রের চেহারাটা কি রকম হবে একটু আঁচ না পেলে ও—ই বা খোঁজে কেমন করে ?"

রাজা বলেন—"কেন ? এই আমার মত চেহারা !"

মন্ত্রী রাজার চেহারার দিকে বার কতক ভালো করে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে থাকেন।

রাজা চটে উঠে বলেন—"চুপ করে আছ যে বড় ? আমার চেহারাটা বলতে চাও খারাপ ?"

"আজ্ঞে মহারাজ, তা কি বলতে পারি ! তবে কিনা, আপনার মত সুপুরুষ এ রাজ্যে আর কোথায় পাবে তাই ভাবছি !"

রাজা খুশি হয়ে দন্ত বিকশিত করে বলেন—"তা বটে, তা বটে ! তবে কি হবে ?"

"এই ধরুন আমাদের—এই না হয় আমারই মত !" মন্ত্রী বলেন।

কোটাল কানে খাট হলেও এ কথাটা শুনতে পায়। তাড়াতাড়ি উঠে

প্রতিবাদ করতে যায়। কিন্তু দরকার হয় না। রাজা তার আগেই হো-হো করে হেসে উঠে বলেন—"পাগল হয়েছ! রাজকন্যা ভয় পেয়ে মূর্ছা যাক আর কি!"

মন্ত্রী মুখ-চোখ লাল করে গম্ভীর হয়ে যান।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় রাজার মত চেহারাই দরকার, তবে অতটা ভালো না পেলে ক্ষতি নেই।

চেহারা মেলে কিন্তু রাজপুত্র হতে কেউ রাজী হয় না। রামনগরের মেয়েদের বড় বদ্‌নাম। তারা নাকি বড় বেশী লেখাপড়া জানে—ফট্ করে যদি কিছু শুধিয়েই বসে!

এদিকে রামনগরের আর তর সয় না। এবার রাজপুত্র না গেলে তারা নিতে আসবেই—দূত বলে গেল।

অগত্যা রাজাকে বরযাত্রী নিয়েই বেরুতে হয়।

বরের পাল্কী খালিই চলে। রাজা বলেন—"ওহে মন্ত্রি, চোখ দুটো একটু সজাগ রেখো। তেমন তেমন দেখলেই তুলে নেবে।"

কিন্তু তেমন আর মেলে না, কাজে কাজেই বরযাত্রীর দল কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে রামনগর ঢোকে।

লোকজন ছুটে আসে—"বর কই, বর কই?" বলে।

রাজা কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলেন—"মন্ত্রি, এইবার যে গেলুম!"

ছোকরা চাকর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সকলকে হাঁকিয়ে দেয়—"বিয়ের আগে আমাদের বর দেখতে নেই।"

রাজা বলেন—"ঠিক ঠিক, মনে ছিল না।"

মন্ত্রী বলেন—"ঠিক বটে, মনে ছিল না।"

কিন্তু বিয়ের দিন ত' আর চালাকি চলে না।

রামনগরের লোক এসে বলে—"বর কই?"

রাজা চান মন্ত্রীর মুখে।

মন্ত্রী চান রাজার মুখে।

ছোকরা চাকর বলে—"আমাদের বিয়ের নিয়ম আলাদা।"

"কি নিয়ম?"

রামনগরের লোক এসে বলে—"বর কই?"

"আমাদের বর সভায় বসে ছদ্মবেশে। রাজকন্যাকে খুঁজে বার করে মালা দিতে হয়।"

মস্ত বড় বিয়ের সভা। লোকজন গিস্-গিস্ করে। সভা জুড়ে বরযাত্রীর

দল বসে থাকে। রাজকন্যা মালা হাতে করে সভায় ঢোকেন। এদিক-ওদিক চেয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে মালা পরিয়ে দেন—ছোকরা চাকরের গলায়।

রাজা চম্‌কে উঠে বলেন—"য়্যাঁ! ও যে—"

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি তাঁর গা টেপেন।

রামনগরের রাজা চোখ পাকিয়ে বলেন—" 'ও যে' মানে?"

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে বললেন—"আজ্ঞে 'ও যে' নয়, 'ওই যে'।"

তবু কটমট করে তাকিয়ে রামনগরের রাজা বলেন—"ওই কে—কি?"

"আজ্ঞে মহারাজ বলতে যাচ্ছিলেন 'এই যে আমাদের রাজপুত্র'।"

রামনগরের রাজা হেসে বলেন—"তাই বল, সে আর কে না জানে!"

* * * * *

রাজা বর-কনে নিয়ে ঘটা করে দেশে ফেরেন।

রামনগরের রাজদরবারে হাসাহাসির ধূম পড়ে যায়। রামনগরের রাজা বলেন—"আচ্ছা বোকা বানান গেছে, কি বল মন্ত্রী?"

রামনগরের মন্ত্রী বলেন—"আজ্ঞে যা বলেছেন।"

রাজা বলেন—"একেবারে বোকার দেশ, কি বল? রাজকন্যা আর মন্ত্রিকন্যার তফাৎ বুঝতে পারল না? ছ্যা ছ্যা!"

কথাটা মন্ত্রীর ভালো লাগে না। তবু রাজার সঙ্গে হাসতে হয়। হাসতে হাসতে বলেন—"কিন্তু রাজপুত্রের চেহারাটা ভালো। রাজা হলে মানাবে।"

রামনগরের রাজা চট্ করে চটে উঠে বলেন—"তার মানে?"

বিশ্বম্ভরবাবুর বিবর্তনবাদ

অতি অল্পের জন্যে বিশ্বম্ভর বসুর নামটা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে আর লেখা হ'ল না।

হ'ল না, সোনার বা সোনা কেনবার অর্থের অভাবে অবশ্য নয়, কারণ বিশ্বম্ভরবাবু ইচ্ছে করলে গোটা ইতিহাসটাই সোনায় বাঁধিয়ে দিতে পারতেন; সে সঙ্গতি তাঁর আছে। কিন্তু সামান্য একটু গণনার ভুলেই সব মাটি হয়ে গেল।

বিশ্বম্ভরবাবু বৈজ্ঞানিক—তাঁর নিজের এ ধারণা আমরা সকলেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকি;—আমরা অর্থাৎ যারা তাঁর বৈঠকখানায় নিত্য ধরনা দিই এবং সকালবেলা চা কেক্ বিস্কুট ইত্যাদি সহযোগে এবং বিকালবেলা লুচি মোহনভোগ ইত্যাদি জলযোগ সমভিব্যাহারে তাঁর বিচিত্র সব বৈজ্ঞানিক গবেষণা গলাধঃকরণ করে থাকি।

বিশ্বম্ভরবাবুর কোন গবেষণা অবশ্য এ পর্যন্ত এষণার বেশী এগোয়নি, কিন্তু তার জন্যে তিনি বিশেষ দুঃখিত নন এবং আমরা তার চেয়েও কম। তিনি প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় আমাদের নানা রকম অপরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনের পরিকল্পনা শোনান। তাতে, আমাদের সামনে যে উপাদেয় আহার্যগুলো ধরে দেওয়া হয়, সেগুলো উদরসাৎ ও হজম করতে আমাদের কোন অসুবিধাই কোনদিন হয়নি।

বরং খাবারের চাট হিসাবে বৈজ্ঞানিক নিত্য-নতুন গবেষণা আমাদের ভালোই লাগে। গবেষণা যেদিন একটু কঠিন হয়, সেদিন জলযোগটাও আমাদের কিছু গুরুতর হয়ে ওঠে। মাছ ধরবার নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যেদিন তিনি ব্যাখ্যা করেন, সেদিন চিংড়িমাছের কাটলেট ও ভেট্‌কিমাছ-ভাজার বহরটাও আমরা বাড়িয়ে নিই। ইঁদুরের দৌরাত্ম্য নিবারণের নতুন পন্থা যেদিন তিনি আবিষ্কার করেন, সেদিন—না, সেদিন আমরা মূষিক-জাতির বিলোপে তাঁকে সাহায্য করি না,

তবে মূষিক যাদের আহার বলে শোনা যায় সেই চীনাদের হোটেল থেকে রসাল কিছু রান্না আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করি।

বিশ্বম্ভরবাবুর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলোর অন্য যে ত্রুটিই থাক, সেগুলো যে অনন্যসাধারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইঁদুরের দৌরাত্ম্য নিবারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটাই ধরা যাক-না কেন ?

সেদিন সন্ধ্যার কথা আমার স্পষ্টই মনে আছে। ছোট ছোট টেবিল সামনে নিয়ে আমরা বিশ্বম্ভরবাবুকে ঘিরে বসেছি তাঁর দরাজ বৈঠকখানায়। তাঁর চাকর আমাদের টেবিলে টেবিলে চিকেন-স্যাণ্ডউইচ্ আর চা দিয়ে গেছে। অমন চিকেন-স্যাণ্ডউইচ্ পেটে পড়লে মগজ আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। আমাদেরও হবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে !

বিশ্বম্ভরবাবু তাঁর জন্যে বিশেষভাবে তৈয়ারী চেয়ারে—বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ বিশ্বম্ভরবাবুর, শরীর সেই পরিমাণে মোটা বলে সাধারণ চেয়ারে তাঁকে আঁটে না—একটু নড়ে চড়ে হঠাৎ বললেন—"আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় হ'ল ইঁদুর—"

"ইঁদুর !"—গণেশ তার প্রথম স্যাণ্ডউইচ্‌টায় সবে এক কামড় দিয়েছে। সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থায় না গিলতে, না ফেলতে পেরে জড়ান স্বরে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে—"ইঁদুর কি ? এই যে শুনলাম চিকেন-স্যাণ্ডউইচ্ !"

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। কিন্তু গণেশকে তখন থামান শক্ত ; বিরক্তিমাখান সুরে সে বললে—"ওই জন্যে চীনে-ফিনে হোটেলের নাম করলে আমি চটে যাই। যা কুচিকুচি কেটে চট্‌কে দিয়েছে কে বুঝবে বল ত...."

বিশ্বম্ভরবাবু এবার বাধা দিয়ে বললেন—"আহা, স্যাণ্ডউইচে ইঁদুরের কথা বলছি না, আমি বলছি আমাদের আলোচনার বিষয় আজ ইঁদুর।"

"ওঃ, তাই বলুন !"—গণেশের গলা দিয়ে স্যাণ্ডউইচ্ নামল এতক্ষণে।

"হ্যাঁ, ইঁদুরের কথাই বলছি, ইঁদুর যে আমাদের কত অনিষ্ট করে, তা নিশ্চয় আপনাদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। কিন্তু এ পর্যন্ত ইঁদুরের দৌরাত্ম্য নিবারণের যত উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে, কোনটিই সম্পূর্ণ সফল হয়নি। কেমন করে সফল হবে ?

বৈজ্ঞানিক মূলনীতিই যে তাতে অনুসরণ করা হয়নি। সে-কারণে জাতা ও খাঁচাকলে একটা-আধটা ইঁদুর ধরা পড়ে' মারা পড়ে বটে, কিন্তু সমগ্র ইঁদুর জাতির প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। তারা বংশানুক্রমে মানুষের শত্রুতা করেই চলে।"

বিশ্বম্ভরবাবু একটু থামতেই আমরা চট্ করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নিলাম। তিনি আবার বললেন—"কিন্তু উপায় কি নেই? ইঁদুরের সঙ্গে মানুষের এ বিরোধ কি ঘুচিয়ে দেওয়া যায় না? চোর-ডাকাতকে কি করে আমরা জব্দ করি, তাদের জন্মগত কুপ্রবৃত্তি সংশোধন করে দিই?"

গণেশ বলে উঠল—"ঠেঙ্গিয়ে!"

বিশ্বম্ভরবাবু মাথা নাড়লেন—"উঁহু, ঠেঙ্গিয়ে নয়। আধুনিক বিজ্ঞানে তা বারণ। আধুনিক বিজ্ঞান বলে—"

আধুনিক বিজ্ঞান কি বলে জানবার আগে আমরা আর একটা স্যাণ্ডউইচ তাড়াতাড়ি শেষ করে সবল হয়ে নিলাম।

বিশ্বম্ভরবাবু বলে চলেন—"আধুনিক বিজ্ঞান বলে, চোর ডাকাত বদ্‌মাসকে শাস্তি দিও না। তাদের বদ্‌রোগের গোড়া উপড়ে ফেলে তাদের স্বাভাবিক মানুষ করে তোলো। ইঁদুরদেরও তাই করতে হবে। তাদের বংশে যেন আর মানুষের অনিষ্ট করার বদ্‌খেয়াল না দেখা দেয়, তাদের প্রকৃতি যাতে শুধরে যায়!"

বিশ্বম্ভরবাবু তারপর সবিস্তারে তাঁর মূষিকোদ্ধার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করছিলেন। স্যাণ্ডউইচের সঙ্গে তার অনেকটাই হজম হয়ে গেছে। যৎসামান্য যা বাকী আছে তা অনেকটা এই রকম—বিশ্বম্ভরবাবু ইঁদুরের চরিত্র সংশোধনের জন্য বিরাট একটি যন্ত্র নির্মাণ করতে চান। সে যন্ত্রটি হবে বিশাল একটি গোলকধাঁধার খাঁচা বিশেষ। যেদিক দিয়ে ঢুকবে সেদিক দিয়ে ইঁদুর বেচারার আর বেরুবার উপায় থাকবে না। ক্রমাগত আঁকাবাঁকা ঘোরানো পথে তাকে ঘুরে চলতে হবে সামনের দিকে। আর সেই পথের বাঁকে বাঁকে থাকবে তার শিক্ষার ব্যবস্থা। যেমন, প্রথম খানিকটা এগিয়ে যাবার পরই দেখা যাবে উপাদেয় এক টুকরো রুটি। ইঁদুরের সাধ্য কি সে

লোভ সামলায়, কিন্তু লোভে পড়ে কামড় দিতে গেলেই মুশকিল। সামনের আয়নায় তৎক্ষণাৎ এক মস্ত হুলো বেড়ালের ছবি ভেসে উঠবে। ইঁদুরকে তৎক্ষণাৎ দৌড়

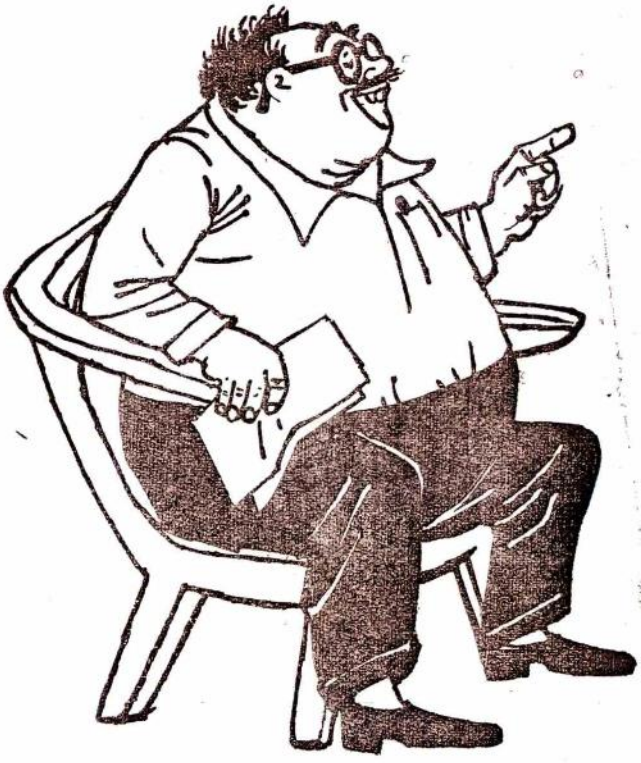

একটু নড়ে-চড়ে হঠাৎ বললেন—"আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় হ'ল ইঁদুর" [৬৪ পৃঃ]

দিতে হবে ভয়ে। অনেকদূর দৌড়ে গিয়ে সে হাঁপিয়ে উঠবে, ক্ষিদেও তার পাবে নিশ্চয়। তখন সামনে দেখা যাবে ভালো একটি বাঁধানো বই কি সিল্কের কাপড়—যা কেটে কুটি-কুটি করবার জন্যে ইঁদুরের দাঁত নিশপিশ করে উঠবে। কিন্তু দাঁত

চালিয়েছে কি লুকানো গ্রামোফোন থেকে মার্জার-সঙ্গীত বেজে উঠবে—ম্যাঁ-ও-ও! আবার ছুট ছাড়া গতি নেই। ছুটতে ছুটতে ইঁদুরের পা ছিঁড়ে যাবার যোগাড়। ক্ষিদেয় পেট চোঁ-চোঁ। তখন দেখা যাবে পথের একধারে কাটা ঘাস আর একধারে খোলা কৌটোয় আমসত্ত্ব কি ডালের বড়ি। ইঁদুর প্রথমে ঘাস খাবে না, আমসত্ত্ব কি বড়ির দিকেই তার টান। কিন্তু কৌটোর দিকে মুখ বাড়াতেই গলায় লেগে যাবে

ফাঁস। একেবারে আধমরা হবার পর সে ফাঁস খুলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে আবার বেড়াল-কুকুরের ডাক। আবার তাকে পালাতে হবে। তারপর অনেক নাকানি-চোবানির পর তাকে নানা ভাবে ঘাসের মাহাত্ম্য বুঝিয়ে, অবশেষে পেটের জ্বালায়

খাস খাইয়ে খাঁচা থেকে বার করে দেওয়া হবে। বিশ্বম্ভরবাবুর মতে এ-খাঁচা থেকে সে একেবারে সাত্ত্বিক ইঁদুর হয়ে বেরুবে। তার দৃষ্টান্ত ও উপদেশে হাজার হাজার ইঁদুরের জীবনের গতি বদলে যাবে। ঘাস যে কত প্রচুর, ঘাস খাওয়া যে কত নিরাপদ তা বুঝে তারা মানুষের অনিষ্ট করা একদম ছেড়ে দেবে। গোলকধাঁধা যন্ত্র থেকে দলে দলে এই রকম প্রচারক ইঁদুর বার করে পৃথিবীর মূষিকজাতিকে চিরদিনের মত উদ্ধার করাই বিশ্বম্ভরবাবুর উদ্দেশ্য।

বিশ্বম্ভরবাবুর এই সব সাধু বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য যতদিন মৌখিক ব্যাখ্যার বেশী এগোয়নি ততদিন বেশ চলেছিল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে রসনার সদ্ব্যবহার করে তাঁকে উৎসাহ দিতে ত্রুটি করিনি।

কিন্তু হঠাৎ ত্র্যহস্পর্শ ঘটে আমাদের এমন বৈঠক ভেঙ্গে গেল। সেই দুঃখের কাহিনীই বলি।

ত্র্যহস্পর্শ-যোগটি এই রকম—বিশ্বম্ভরবাবু কিছুদিন থেকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। কোথা থেকে কি ভাবে আমরা মানুষ হয়েছি সকাল-বিকাল তাই বোঝানই হয়েছিল তাঁর কাজ।

ছেলেবেলা পাকা কুল ও ডাঁসা পেয়ারার লোভে গাছে আর কে না উঠেছে! কিন্তু তাই বলে মানুষজাতটাই তাদের ছেলেবেলায় গাছ থেকে নেমে এসেছে, এ মতটা আমাদের তেমন মনঃপূত হচ্ছিল না। এমন কি, সকাল-বিকালের জলযোগের ঘটা বাড়িয়েও আমাদের অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পেরে বিশ্বম্ভরবাবু একদিন একটি জ্যান্ত গেছো বাঁদর আমদানি করে বসলেন। বৈঠকখানার বাইরের বারান্দায় শেকল দিয়ে সেটাকে বেঁধে রাখা হ'ল আমাদের শিক্ষার সুবিধার জন্যে।

বাঁদরের সঙ্গে আমাদের গাছতুত জ্ঞাতিত্বের সম্পর্ক যখন আমরা বিশ্বম্ভর-বাবুর বক্তৃতার ভয়ে প্রায় মেনে নিয়েছি, তখন হঠাৎ কোথা থেকে আমাদের পাড়ায় এক প্রাণান্তকর চুলকানোর আবির্ভাব হ'ল! সে চুলকানো আমাদের সকলকে চঞ্চল করে ত তুললই, বিশ্বম্ভরবাবুর বৈজ্ঞানিক বপুকেও বাদ দিলে

না। বিবর্তনবাদ, বাঁদর ও চুলকানো এই ত্র্যহস্পর্শ-যোগ থেকেই বিশ্বম্ভরবাবুর নতুন গবেষণার সূত্রপাত এবং আমাদের বৈঠকের অপঘাত।

বিশ্বম্ভরবাবু সেদিন দুপুরবেলা বৈঠকখানায় বসে বিবর্তনবাদের একটা মোটা বই আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে হস্তচালনাও চলছে চুলকানোর তাড়নায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুলকানোরই জয় হ'ল। হবারই কথা। যুগপৎ হাত ও মাথা ত' চালান যায় না। বিশেষ করে যখন মনে হয় যে, চুলকানো যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই পরমকারুণিক পরমেশ্বরের পক্ষে মাত্র দুটি হাত মানুষকে দেওয়া অত্যন্ত অবিচার হয়েছে! রাবণের মত বাহুর বাহুল্য যাদের আছে, চুলকানো একমাত্র তাদেরই অঙ্গে শোভা পায় ও সুখ দেয়।

শুধু হাতে সুবিধে করতে না পেরে বিশ্বম্ভরবাবু পাখার বাঁট প্রয়োগ করতে বাধ্য হন এবং তারপর পাগলের মত বেরিয়ে আসেন বারান্দায়। বিবর্তনবাদের বই অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে।

বারান্দায় কিন্তু যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ে তাতে খানিকক্ষণের জন্যে চুলকানোর জ্বালাও বুঝি তিনি ভুলে যান। তাঁর এমন ভুক্তভোগী সমব্যথী যে সেখানে আছে তাও তিনি এতদিন লক্ষ্য করেন নি! গাছতুত জ্ঞাতিত্বের নতুন পরিচয় লাভ করে তিনি চমৎকৃত হয়ে যান। তিনি ও তাঁর বাঁদর, দু'জনেরই এক জ্বালা; বাঁদরের চুলকানো 'ক্রনিক' এবং তাঁর ক্ষণিক—এই মাত্র তফাৎ।

খানিকক্ষণ উভয়ের চুলকানোর পাল্লা চলে, তারপর হঠাৎ এক আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক সত্য বিশ্বম্ভরবাবুর মনে প্রতিভাত হয়, নিউটনের মনে যেমন হয়েছিল গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখে।

'চুলকানো!—চুলকানো! শুধু চুলকানোতেই সমস্ত রহস্যের মীমাংসা, চুলকানোতেই বিবর্তনের সূত্রপাত,—চুলকানোই বৈজ্ঞানিক ধাঁধার উত্তর—মিসিং লিঙ্ক।'

সেদিনকার সান্ধ্য বৈঠকেই—পাখা নয়, পাখার বাঁট চালাতে চালাতে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁর নতুন 'থিওরি'র পত্তন করেন।

বিশ্বম্ভরবাবু গম্ভীর মুখে বলেন—"বাঁদর! বিবর্তনবাদের মূর্তিমান এই যে প্রমাণ, একে আপনারা লক্ষ্য করেছেন ভালো করে? কেউ করেছে এ পর্যন্ত? বলুন দেখি কি তার বিশেষত্ব, কি সে করে?"

গণেশ বলে—"কি আর করে? বাঁদরামি!"

বিশ্বম্ভরবাবু অধৈর্য হয়ে ওঠেন—"না, না,—হ'ল না।"

আমরা সবাই নানা রকম পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় দিই। কেউ বলে—"বাঁদর গাছে গাছে লাফায়"; কেউ বলে—"মুখ ভ্যাংচায়"; কেউ বলে—"কিচির-মিচির করে"; কিন্তু বিশ্বম্ভরবাবু সকলের ভুল সংশোধন করে বলেন—"না; বাঁদর গা চুলকায়, সারা দিনরাতই চুলকায়। তার চুলকানো কোন জন্মে সারে না।"

আমরা এই অভাবিত আবিষ্কারে বিমূঢ় হয়ে বসে থাকি। বিশ্বম্ভরবাবু তাঁর 'থিয়রি' আরো সরলভাবে বুঝিয়ে দেন—"বাঁদরের সঙ্গে আমাদের এই যে প্রভেদ সে কেবল চুলকানোর দরুন। চুলকানো যে কি বস্তু তা আমরা সকলেই জানি। চুলকানোর সময় মানুষের আর জ্ঞান থাকে না। কোন বিষয়ে মনোযোগ দেবার ক্ষমতা থাকে না। বুদ্ধি থেকেও তা কাজে লাগে না। বাঁদরদের হয়েছে তাই। বুদ্ধি তাদের আছে, কিন্তু চুলকানোয় তারা এমন ব্যতিব্যস্ত যে সে-বুদ্ধি খাটাতে পারে না। স্থির হয়ে একদণ্ড বসতে না পারলে বুদ্ধি ব্যবহার করবে কি করে? মানুষ যে বাঁদরদের চেয়ে উন্নতি করেছে সে কেবল তার চুলকানো এমন দুরারোগ্য নয় বলে।"

আজ বাদে কাল বৈজ্ঞানিকদেরও তিনি স্বীকার করিয়ে ছাড়বেন যে, প্রথম যে-বাঁদরের চুলকানো সেরে গেছল তার থেকেই মানুষের সভ্যতা শুরু। চুলকানো সারিয়ে তাদের সভ্য করে তোলা যায়।

বিশ্বম্ভরবাবুর প্রস্তাবের কোনো প্রতিবাদ হয় না।

সমারোহ সহকারে তার পরদিনই বাঁদরের চর্মরোগ সারাবার আয়োজন

শুরু হয়। ডাক্তারখানা থেকে দামী দামী মলম আসে, বাক্স বাক্স কার্বলিক সাবান খরচ হয়ে যায়।

কিন্তু ফল তেমন সুবিধে হয় না। দেখা যায়, চুলকানো সারাবার আগেই বাঁদর বেচারার পেটের রোগ হয়ে গেছে। সে নাকি তার গায়ের মলম চেটেই সাবাড় করে দেয়।

এলোপ্যাথির বদলে কবিরাজী এবং তারপর হোমিওপ্যাথির ব্যবস্থা যখন হয় তখন বাঁদরের অবস্থার বেশ একটু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে—লম্ফঝম্ফ ছেড়ে সে কাৎ হয়ে শুয়েই থাকে দিনরাত।

গণেশ সংশয়ের সুরে বলে—"বেচারা বোধ হয় চিকিৎসার চোটে টেঁসেই গেল!"

বিশ্বম্ভরবাবু চটে ওঠেন রীতিমত—"চিকিৎসার দোষটা কি?"

গণেশ বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলে—"চিকিৎসাটাই হয়তো দোষ। চুলকানোটাই হ'ল ওর বাঁদরামি। সেটাই যদি সেরে গেল তবে ও বাঁচবে কিসের জন্যে?"

"তুমি ছাই বোঝ"—বিশ্বম্ভরবাবু বিরক্ত হয়ে ওঠেন—"এই শান্তশিষ্ট হওয়া, এটাই হ'ল উন্নতির লক্ষণ। ওর বাঁদরামি কেটে যাচ্ছে!"

কিন্তু বাঁদরামি কেটে গেলেও তার সভ্য হবার আগ্রহ দেখা গেল না।

বিশ্বম্ভরবাবু নানা রকম বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি পরীক্ষা করেন। বাঁদরটা কাৎ হয়ে শুয়েই থাকে, কেবল মাঝে মাঝে দন্তবিকাশ করে—সেটা হাসির না দুঃখের বোঝা যায় না ঠিক।

অবশেষে গণেশের মাথা থেকে বুদ্ধি বেরোয় একদিন। ব্যাপারটা সে-ই তলিয়ে বোঝে।

"ও কিছুতেই কিছু শিখবে না।"—গণেশ মন্তব্য করে।

"কেন?"—বিশ্বম্ভরবাবু জিজ্ঞাসা করেন অবাক হয়ে।

"অত লজ্জা থাকলে কেউ কিছু শেখে?"—গণেশ গম্ভীরভাবে বলে।

"লজ্জা আবার কিসের ?"—আমরা সবাই অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

"লজ্জা ওর ল্যাজের।"

ঠিক কথাই ত! ল্যাজই হ'ল বানরের বা, ওটা বাদ দিলেই আর তফাৎ নেই। বিশ্বম্ভরবাবু উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। স্থির হয়, অবিলম্বে লাঙ্গুলের কলঙ্ক থেকে তাকে মুক্ত করা হবে এবং লাঙ্গুল মোচন করবেন স্বয়ং বিশ্বম্ভর বাবু। বাঁদর যেন তাঁরই কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকে।

কিন্তু হায়, লাঙ্গুল থেকে এত বিপত্তি হবে কে জানত! কিংবা রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের কথা স্মরণ থাকলে কে না জানত! আয়োজনের কোন ত্রুটিই হয়নি। ছুরি, কাঁচি, তুলো, তোয়ালে, আয়োডিন ইত্যাদি সবই মজুত। কয়দিন থেকে বাঁদর বেচারা যে রকম শান্তশিষ্টের মত কাৎ হয়ে কাটাচ্ছিল তাতে মনে হয়েছিল কৃতজ্ঞচিত্তেই সে নিজের কলঙ্ক মোচনে সায় দেবে, বিশেষ করে কড়া ক্লোরোফর্ম সেবনের পর।

লাঙ্গুলের কলঙ্ক থেকে তাকে মুক্ত করা হবে এবং লাঙ্গুল মোচন করবেন স্বয়ং বিশ্বম্ভরবাবু।

তার বদলে ল্যাজে হাত দিতেই হতভাগা লাফ দিয়ে উঠে এমন কামড় দিলে—আর দিলে কিনা স্বয়ং বিশ্বম্ভরবাবুকে !

হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেল তৎক্ষণাৎ। তুলো, তোয়ালে, আয়োডিন বাঁদরের বদলে বিশ্বম্ভরবাবুর কাজেই লেগে গেল। ঘা ধুইয়ে বেঁধে আমরা তাঁকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলাম আর অকৃতজ্ঞ বাঁদরটাকে শেকল খুলে পাঠালাম রাস্তায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের সেইখানেই শেষ নয়। পরের দিন খবর নিতে গিয়ে দেখি, বিশ্বম্ভরবাবু বেশ বদলে গেছেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আর যেন তাঁর গা নেই। কোথায় গেল চা আর জলখাবার! অনেকক্ষণ বসে থেকে তার কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। একটা বাঁদর নেমকহারাম হলেও সব বাঁদর তেমন নয় বলে, আরেকটা বাঁদর আনিয়ে পরীক্ষা করার প্রস্তাবে তিনি যেন চটেই গেলেন। গণেশটা সহানুভূতি জানাতে গিয়ে আরও গোল বাধালে।

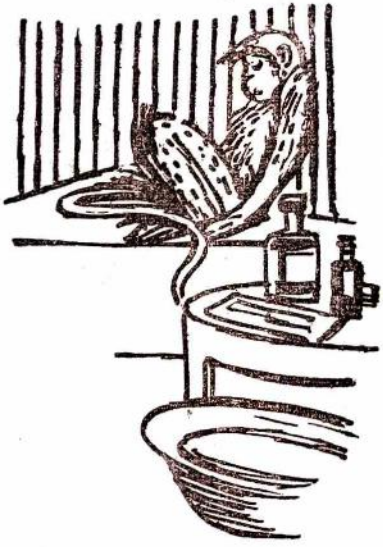

"কিন্তু খুব সাবধান বিশ্বম্ভর-বাবু! বাঁদরের দাঁতে বড় বিষ, বেশ কিছু গোলমাল হতে পারে!"—বললে গণেশ।

বিশ্বম্ভরবাবু ভীত হয়ে উঠলেন —"তাই নাকি। কি হয় বলুন ত?"

"কি না হতে পারে?" গণেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল এ প্রসঙ্গে। তার এক মাসতুত ভাই ডাক্তার কিনা! বললে—"হতে পারে সেপ্‌টিসিমিয়া, হাইড্রোফোবিয়া!"

"হাইড্রোফোবিয়া ?"—বিশ্বম্ভরবাবু একটু বিমূঢ়।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই যাকে বলে জলাতঙ্ক।"

"জলাতঙ্ক কেন হবে ?"—বিশ্বম্ভরবাবু বিরক্ত।—"জলাতঙ্ক ত কুকুর কামড়ালে হয়। আমায় ত বাঁদরে কামড়েছে।"

"ও কুকুর আর বাঁদর একই কথা। মোটমাট একটা আতঙ্ক কিছু হবেই"—গণেশ তাঁকে আশ্বাসের সুরে বললে—"জলাতঙ্ক না হয় স্থলাতঙ্ক !"

"স্থলাতঙ্ক আবার কি ?"—বিশ্বম্ভরবাবু বিহ্বল।

"ওই জলাতঙ্কেরই ভায়রা ভাই। কুকুর জল পছন্দ করে না, তাই কুকুর কামড়ালে হয় জলাতঙ্ক, আর বাঁদর গাছে থাকে, তাই বাঁদর কামড়ালে —স্থলাতঙ্ক।"

"তা হলে উপায় ?"—বিশ্বম্ভরবাবু শঙ্কিত।

"উপায় বলতে গেলে নেই !"—গণেশের স্বর সান্ত্বনায় স্নিগ্ধ—"জলাতঙ্কের ইঞ্জেক্‌শন বেরিয়েছে, কিন্তু স্থলাতঙ্কের কোন ওষুধ ত নেই !"

"ওষুধ নেই ?"—বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় মূর্ছিত।

"তবে আপনি এক কাজ করতে পারেন। স্থল পরিত্যাগ করতে পারেন একেবারে ! স্থলে না থাকলে ত আর স্থলের আতঙ্ক হতে পারবে না।"—গণেশ নিজের অনুপ্রেরণায় উল্লসিত হয়ে উঠল।

"কিন্তু কোথায় থাকব তা হলে ?"—বিশ্বম্ভরবাবু চিন্তিত।

"কোথায় আবার ?—জলে !"—গণেশ সোৎসাহে জানালে।

খানিক অন্যমনস্কভাবে চুপ করে থেকে বিশ্বম্ভরবাবু বললেন—"আচ্ছা, ভেবে দেখি। আপনারা আজ তা হলে আসুন।"

চা ও জলখাবার তখনও এসে না পড়ায় আমরা আরও খানিকক্ষণ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এরকম স্পষ্ট জবাবের পর বসে থাকা যায় কি ?

* * * * *

তারপর আর কিছুই লেখবার নেই। বিশ্বম্ভরবাবু আহাম্মুক গণেশটার কথা ওভাবে গ্রহণ করবেন কে ভেবেছিল! সেই থেকে স্থলাতঙ্কের ভয়ে তিনি জাহাজে পৃথিবী 'টুর' করে বেড়াচ্ছেন। জাহাজ থেকে ডাঙ্গায় পর্যন্ত নামেন না। বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে তাঁর যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর শেষ হয়নি। আমাদের বৈঠকও ভেঙ্গে গেছে।